



মুঘল ভারত

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত



BanglaBook.org

মুঘল ভারত

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রণীত

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

শিশির পাবলিশিং হাউস

১৯৭ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রীট,

কলিকাতা ।

মির্জা ফর্গাণা [বর্তমান সময়ে ফর্গাণা বা ঘোকন্দ রুশিয়া রাজ্যভুক্ত] রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। বাবরের জননী চেঙ্গিস-খাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য বাবর মুঘল বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারত রাজ্য মুঘল রাজত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বাবরের পিতা ওমর শেখ রাজ্যলোভী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার একমাত্র অভিপ্রায় ছিল রাজ্যবিস্তার করা। ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের জন্ম হয় এবং ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। এসময়ে ফরগণা রাজ্যের রাজধানী আখশি নামক একটা দুর্ভেদ্য দুর্গবেষ্টিত নগরে অবস্থিত ছিল। বাবরের পিতা ওমরশেখ বেশ গুণবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার শরীরে অসাধারণ শক্তি ছিল। এদিকে তিনি কবিতা আবৃত্তি করিতে, গল্প-কৌতুকে সঙ্গিগণের মনোরঞ্জন করিতে ও শিকার করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে মত্ত পান করিতেন এবং খুব পার্শ্ব খেলিতেন। অতিরিক্ত সুরাপানের দরুন, সময় সময় হট্কারিতার পরিচয় দিলেও তিনি সদাশয় এবং নিরোত্ত ব্যক্তি ছিলেন, অর্থের প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না। একবার চুক্কাস্থানের উজ্জবেগ্দের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়। সেই

যুদ্ধে উজ্জবেগেরা পরাজিত হইল এবং তাহাদের ধন-সম্পত্তি,

বাবরের পিতা ঐশ্বর্য্য সম্পদ সমুদয়ই বাবরের

ও মাতার পরিচয় হস্তগত হইল, কিন্তু তিনি উহার এক

কপদকও গ্রহণ না করিয়া প্রকৃত

অধিকারীদিগকে ডাকিয়া আনিয়া বিলাইয়া দিলেন—এমনি

ছিল তাঁহার অর্থ সম্বন্ধে নির্লোভ ব্যবহার। বাবর তাঁহার

জীবনে বোধ হয় পিতার আদর্শেই এইরূপ নির্লোভ হইতে

পারিয়াছিলেন। পিতার মহাপ্রাণতা ও উদারতা যেমন

বাবরের চরিত্রে বিকশিত হইয়াছিল, তেমনি মাতার

শুণাবলী ও প্রতিভা বাবরের চরিত্র-মধ্যে সমাক্ ভাবে

পরিষ্ফুট হইয়াছিল। বাবরের মাতা প্রতিভাশালিনী

বিদূষী মহিলা ছিলেন : তিনি তুর্কী ও পারস্যভাষায় অভিজ্ঞা

ছিলেন, গৃহস্থালী কার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন এবং কোন কোন

ঐতিহাসিক বলেন যে তিনি অতি সুন্দর কবিতাও

রচনা করিতে পারিতেন। পিতা ও মাতা দুই জনেই

প্রতিভাশালী ছিলেন বলিয়া বাবরও সুপাণ্ডিত এবং

খ্যাতিমান ব্যক্তি হইতে পারিয়াছিলেন। বাবরের

মাতামহী ইসমানদৌলত বেগম সে যুগের নারী-সমাজে

সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন।

বাবর পিতার মৃত্যুর পর ফরগণার রাজা হইলেন।

তুর্কীস্থানের অন্তর্গত সির নদের তীরবর্তী এই
ফরগণা রাজ্যটি অতি সুন্দর ছিল। বাবর ফরগণা
রাজ্যের রাজধানী আন্দিজান (Andijan) সম্বন্ধে
বলিয়াছেন—‘সহরটি অতি সুন্দর। চারিদিকে নীল পর্বত
শ্রেণী বেষ্টিত। কোথাও বা সাদা বরফে ঢাকা চূড়াগুলি
সূর্যালোকে গলিত স্রবণের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।
এদেশের ভূমি উর্বর ও শস্য শ্যামল এবং ফুলে ফলে
অপূর্ব শোভামণ্ডিত। এদেশের ফল যেমন আকারে বৃহৎ
তেমনি সুমিষ্ট। আর এদেশের বনে বনে শিকারের
অভাব নাই।’ এইরূপ সুন্দর দেশের অধিবাসী হইয়া

বাবরের বাল্যজীবন

—সাহস ও বীরত্ব

বাবর অতি শৈশব হইতেই যুগ্মা-
প্রিয় এবং সস্ত্র-বিদ্যায় সুনিপুণ
হইয়া উঠিয়াছিলেন। অধিকাংশ

সময়ই তিনি বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইতেন। তিনি
এতদূর কষ্ট-সহিষ্ণু ছিলেন যে শীতের দেশের বর্ষাকাল
নদীর অতি শীতল জলের মধ্যেও সাঁতার দিয়া উত্তীর্ণ
হইতেন। কখনও শিকার করিতে বাহির হইলে কিংবা
কোথাও ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে তাঁহার সম্মুখে
যে সকল নদী পড়িত তাহা তিনি সাঁতারাইয়া
পার হইতেন।

ফরগণা রাজ্যের সর্বত্র তাঁহার গতিবিধি ছিল। তিনি উহার সব পথবাট চিনিতে। একবার মৃগয়া করিতে বাহির হইয়া তাঁহার দলের সকলে পথ হারাইয়া কেলিলেন। শিকারের উদ্দেশ্যে কাহারও লক্ষ্য ছিল না যে তাঁহার। কোন্‌দিকে অগ্রসর হইতেছেন। একে শীতকাল তাহাতে আবার ভয়ানক অন্ধকার রাত্রি, ভীষণ বেগে ঝড়ের মতন হাওয়া বহিতেছে। সঙ্গীরা কেহই কোন্‌দিকে অগ্রসর হইতেছেন নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না, সকলেই অপরিচিত প্রান্তরে জীবন বিসর্জন দিতে হইবে বলিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই বিপদ সময়ে বাবর নিজের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া সকলের আগে অন্বেষণ করিয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং সকলের চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁহার পথ নির্দেশ করিতে এতটুকু ভুল হয় নাই। কেননা ঐ পথে তিনি পূর্বেও অনেকবার যাতায়াত করিয়াছিলেন। বাবরের আর একটা গুণ ছিল তাঁহার মৃগপ্রিয়তা। স্মর্যবংশের যে কোন ব্যক্তি শত দোষে দোষী হইলেও তাঁহাকে তিনি মার্জনার চক্ষে দেখিতেন।

রাজ্য হইবার অব্যবহিত পরেই শত্রু কর্তৃক

আক্রান্ত হইয়া বাবরকে একে একে খোজইন্দু, মাঝিনান্ এবং অপর একটা নগরীর অধিকারচ্যুত হইতে হইয়াছিল। দুই বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার শত্রুগণের সহিত কলহ ও বিবাদে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, তৎপর অল্প সময়ের জন্য তিনি একটু শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে মধ্য-এসিয়ার সমরখন্দ তিনি জয় করেন। সমরখন্দ বিজয়ের (নবেম্বর ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ) পর তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে লুণ্ঠরাজ করিতে না দেওয়ায় তাহারা অনেকেই বাবরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

সমরখন্দ জয়ের উল্লাস প্রশমিত না হইতেই সংবাদ আসিল যে উজবেগেরা ফরগণা আক্রমণ করিয়াছে, কাজেই তাঁহাকে ফরগণার দিকে ফিরিয়া আসিতে হইল; কিন্তু তিনি ফরগণা রক্ষা করিতে পারিলেন না। রাজধানী আন্দিজান রক্ষা করিতে যাইয়া তাঁহাকে ফরগণাও হারাইতে হইল। বাবর লিখিয়াছেন—“আমি একটিকে বাঁচাইতে যাইয়া দুইটাকেই হারাইলাম।” কিন্তু বাবরের ম্যায় নিজীক এবং সাহসী ব্যক্তি হুগ্গ করিয়া থাকিবেন ইহা কখনও সম্ভবপর নহে, তিনি পুনরায় মাত্র দুই শত চল্লিশ জন সঙ্গী সহ ঐ দুই রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন, কিন্তু রাখিতে পারিলেন না, পুনরায় বিভাড়িত হইতে

হইল। অবশেষে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাবুল রাজ্য জয় করেন। এ সময়ে কাবুল বলিতে শুধু কাবুল এবং

কাবুল-বিজয়

গজনি প্রদেশকেই বুঝাইত। ঐ অংশটাকে আমরা পূর্ব-আফগানি-

স্থান নামে অভিহিত করিতে পারি। এ সময়ে হিরাট একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য ছিল, কান্দাহার, বাজোর, মোরাট এবং পেশোয়ার প্রভৃতি কাবুলের সহিত সম্পর্ক বিরাহিত প্রধানদের দ্বারা শাসিত হইত। সমতল ভূমির অধিবাসী বিবিধ জাতি সমূহ এবং নিম্ন উপত্যকার অধিবাসীরা ঐ দেশের রাজাদের অধীনতা স্বীকার করিত। ঐ সময়ে কাবুলে অরাজকতা বিद्यমান ছিল, রাজা আবদুল রিজাক কান্দাহারের শাসনকর্তার পুত্র মুহম্মদ মকিম কর্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এইরূপ অশান্তি ও গোলযোগের স্রবোগেই বাবর কাবুল অতি সহজে অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কাবুলের রাজা হইয়া বাবরের মনে ভারত-জয়ের ইচ্ছা হইল। কারণ ভারতের অতুল ঐশ্বর্যের কথা এবং

ভারত-জয়ের

আশা

তাঁহার পুত্র পুরুষেরা যে ভারত জয় করিয়া অনেক ধন রত্ন লইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন তাহাও

তাহার অজানা ছিল না, সুতরাং তিনি তাহার যে তুর্কী মুঘল ও আফগান সেনা ছিল, তাহাদের লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাবরের ভারত-বিজয়

বাবর তাহার জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন—“৯১০ হিজরী অর্থাৎ [১৫০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দ) কাবুল-বিজয়ের সময় ইহাতে আমি সর্বদাই হিন্দুস্থান বশীভূত করিবর জন্য ইচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু নানা কারণে পারি নাই, কোনবার তত আমার আমিরগণ বাধা দিয়াছেন কখনও বা আমি নিজের কোনও উপায় নির্ধারণ করিয়া উঠিতে পারি নাই, কোন সময়ে আমার প্রাণ নানারূপ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন বলিয়া হিন্দুস্থান আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা



The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

করিতে পারি নাই। কিন্তু অবশেষে নানারূপ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ৯২৫ হিজিরী অর্কে আমি সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম এবং এই সময় হইতে ৯২৫—৯৩২ হিজিরী (১৫২৬ খ্রীঃ) পর্যন্ত আমি হিন্দুস্থানের কার্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে নিরত ছিলাম, এবং সাত আট বৎসরে সসৈন্য পাঁচবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম। পঞ্চমবার মহান্ পরমেশ্বর করুণা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া সুলতান ইব্রাহিমের নায় প্রবল শত্রুকে পরাভূত করিয়া আমাকে গৌরবপূর্ণ হিন্দু সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছেন।” বাবর যখন চতুর্থবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইব্রাহিমের শাসন-ক্ষমতা একেবারেই ছিল না, তাঁহার রাজত্বকালে রাজশক্তি বিচ্ছিন্ন ও হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। ইব্রাহিমের ভ্রাতৃচারে প্রপীড়িত হইয়া পঞ্জাবের শাসন কর্তা দৌলত খাঁ এবং ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলীউদ্দীন ওরফে আলম খাঁ পলায়ন করিয়া কাবুলে বাবরের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। বাবর এইরূপ উত্তম সুযোগ উপেক্ষা করা একেবারেই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করিলেন না, তিনি মনে করিলেন

আলম খাঁর ন্যায় একজন ক্ষমতাশালী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য পাইলে অতি সহজেই তাঁহার অভ্যুত্থান সিদ্ধ হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া আলম খাঁকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে বিপুল সৈন্যসহ অচিরে তিনি পঞ্জাবে আসিয়া

দিল্লী আক্রমণ
করিবার জন্য
আহ্বান

উপস্থিত হইলেন। বাবর অতি সহজেই উক্ত প্রদেশ অধিকার করিলেন এবং আলম খাঁকে দিল্লিপুত্রের শাসনকর্তার পদে

নিযুক্ত করিলেন কিন্তু দৌলত খাঁর আচরণে সন্দেহের উদ্বেগ হওয়ায় তিনি তাঁহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন না।

বাবর পঞ্জাব-রক্ষার জন্য কতিপয় বিশস্ত সৈনিক পুরুষকে সেখানে রাখিয়া সৈন্য-সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যের জন্য কাবুলে গমন করিলেন। বাবর পঞ্জাব পরিত্যাগ করিবার পরই দৌলত খাঁ যুদ্ধ করিয়া আলম খাঁকে দিল্লিপুত্র হইতে তাড়াইয়া দিলেন। আলম খাঁ বিপন্ন অবস্থায় কাবুলে গমন করিলেন। ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বাবর আলম খাঁর সহিত বার হাজার সৈন্য সহকারে পঞ্জাবে উপনীত হইলেন। দৌলত খাঁ চল্লিশ হাজার সৈন্য লইয়া তাঁহার গতি রোধ করিবার জন্য

ঐশ্বর্য হইলেন কিন্তু মূল্যের আক্রমণের কাছে তাহার সৈন্যগণ ভিজিতে পারিল না। দৌলত খাঁর সৈন্যদলকে ঐ ভাবে পর্যুদন্ত করিয়া বাবর ধীরে ধীরে পাণিপথের বিশাল প্রান্তরে আসিয়া সসৈন্যে শিবির সংস্থাপন করিলেন।

বাবর সৈন্যসহকারে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন ইহা ইব্রাহিম লোদী জানিতে পারিয়া সসৈন্যে পাণিপথের ভীষণ প্রান্তরভূমে আসিয়া উপস্থিত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। আমরা এখানে বাবরের আশ্চরিত

হইতে এই বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া
পাণিপথের যুদ্ধ

—১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ—

দিতেছি। বাবর লিখিয়াছেন—

“আমাদের বিরুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী

প্রায় এক লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন। সম্রাটের সেনাপতি ও হস্তীর সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তাহার অর্থের কোন অভাব ছিল না, কেননা তিনি পিতা ও পিতামহের সমৃদ্ধ ধনরাশির অধিকারী ছিলেন। এই ধনরাশি প্রচলিত মুদ্রায় আবদ্ধ ছিল, এজন্য তিনি অতি সহজেই সে অর্থের ব্যবহার করিতে পারিতেন। শত্রুগণ যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তদনুরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে যে সকল মুকব্বারসায়ী বেতন গ্রহণ

করিয়া কাজ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সংগ্রহ করিবার জন্ত প্রচুর অর্থব্যয় করিবার রীতি ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। এই সৈন্যদিগকে বধিনদি (Badhin di) বলে। যদি ইব্রাহিম এই রীতির অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে আরও এক লক্ষ ক্রি দেড়লক্ষ সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারিত। কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রত্যেক বিষয় মঙ্গলের জন্তই পরিচালিত করিয়াছিলেন। এমন কি, নিজের সৈন্যদিগকে সম্ভুষ্ট করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার ছিল না; তিনি আপনার ধনরাশিও ব্যয় করিতেন না। তিনি যতদূর সম্ভব কৃপণ ও ধনসঙ্কে অপরিমিত প্রয়াসী ছিলেন, একপ অবস্থায় সৈন্যদিগকে সম্ভুষ্ট রাখা কিরূপে সম্ভবপর? তিনি অপরিণত বয়স্ক, অনভিজ্ঞ এবং সৈন্য পরিচালনা সম্বন্ধে অমনোযোগী ছিলেন; তিনি বিশৃঙ্খল ভাবে অভিযান অথবা প্রস্থান করিতেন, এবং ভবিষ্যত দৃষ্টি না করিয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। যে সময়ে সৈন্যগণ পাণিপথ ও পার্শ্ববর্তী স্থানে আপনাদের অবস্থান-ভূমি কামান, বৃক্ষ-শাখাও পরিখা দ্বারা সুদৃঢ় করিতেছিল তখন দরবেশ মোহাম্মদ সারবান আমাকে বলিয়াছিলেন, আপনি আমাদের অবস্থান-ভূমি একরূপ সুদৃঢ় করিয়াছেন যে, ইহা সম্ভবপর নহে যে, তিনি কখনও এখানে আসিতে উদ্যত হইবেন।

উভয় সৈন্য যুদ্ধের জন্য শিবির সংস্থাপন করিয়াও কয়েক দিন নীরব রহিল। কেহই প্রথম আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল না। এই ভাবে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, ২০শে এপ্রিল তারিখ রাত্রিকালে বাবর সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে শত্রু শিবির আক্রমণ করিয়া অধিকার করিতে যত্ববান হইলেন। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে সৈন্যসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় তিনি কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। মুঘলেরা সে রাত্রিতে পরাজিত হওয়ায়, ইব্রাহিম মনে করিলেন যে শত্রুপক্ষীয়েরা সেরূপ বলশালী নহে, কাজেই পরদিন প্রত্যুষে সসৈন্যে গড় ও পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া শত্রুদলের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। এইবার দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দিবা দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল।

পাণিপথের যুদ্ধ

আরম্ভ

আফগান-সৈন্য সংখ্যায় অপরিমিত

হইলেও নেতৃত্বের অভাবে ও

অযোগ্য সেনাপতির পরিচালনায়

ছত্রভঙ্গ হইয়া, যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।

প্রায় পঞ্চদশ সহস্র আফগান সৈন্য স্থায়ী প্রভুর

কার্যে জীবন-বিসর্জন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ

দিয়াছিল। ইব্রাহিম লোদী শত্রু হস্তে প্রাণ হারাইলেন।

মুঘল সৈন্যেরা তাঁহার ছিন্ন শির বাবরের নিকট আনয়ন

করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে বাবরের সেনাপতি ওস্তাদ আলির অধীনে গোলন্দাজ সৈন্যগণ অগ্নিবর্ষণ করিয়াছিল।

ইহার পূর্বে ভারতবর্ষে কখনও
কামানের ব্যবহার হয় নাই।
কামানের

মুঘল সৈন্যেরা সংখ্যায় অল্প

হইলেও এই যুদ্ধে অসাধারণ সাহসিকতা এবং যুদ্ধ পটুতা প্রদর্শন করিয়াছিল। বাবর এই যুদ্ধ-বিজয়ের পরে স্বীয় আশ্চরিতে লিখিয়াছেন—“পরম কারুণিক পরম শক্তিশালী জগদীশ্বরের অনুগ্রহে এই বিজয় ব্যাপার আমার কাছে অতি সহজসাধ্য হইয়াছিল এবং সেই বিপুল সৈন্য-বাহিনী অল্প দিবসের মধ্যেই ধূলিবৎ উড়িয়া গিয়াছিল।”

এই ভাবে অতি সহজে রণক্ষেত্রে বিজয়লাভ করিবার পর বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিবার জন্য দুই দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন, এবং পরদিবস প্রত্যুষে নিজে

আগ্রার দিকে যাত্রা করিলেন।
আগ্রা ও দিল্লী
অধিকার

২৭শে এপ্রিল শুক্রবার দিল্লীর
প্রত্যেক মসজিদে মসজিদে এই

রণ-বিজয়ী নূতন সম্রাটের নামে জেত বা গাঠিত হইয়াছিল।

বাবর আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করিয়া অত্যন্ত প্রীতি-লাভ করিলেন। রাজকোষের সম্বিত প্রচুর অর্থ তাঁহার



বাবরের সেনাপতি হুমায়ুনকে অবাঞ্ছিত গোলন্দাজ সৈন্যদল

অগ্নিবদন করিয়েছিল।

মুঘল ভারত পৃ ১৪

হাতে পড়িল। অর্থ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন। অর্থ বিতরণ করাতেই অর্থের সার্থকতা ইহা তিনি মনে করিতেন, কাজেই সেই রাজকোষের প্রাপ্ত অগণিত ধনরাশি অর্থলোভী সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। রাজ-কুমার হুমায়ুন যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই জন্য বাদশাহ তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ সতের লক্ষ দাম (প্রায় তিনলক্ষ টাকা) প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক বেগ নিজ নিজ শৌর্য্য বীর্য্য ও পারদর্শিতা অনুসারে ছয় লক্ষ হইতে দশ লক্ষ দাম পর্য্যন্ত পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সৈনিক পুরুষ, শিবির-সঙ্গী ও দোকানদারেরা পর্য্যন্ত খয়রাত লাভ করিয়াছিল। যে সকল রাজকুমারেরা উপস্থিত ছিলেন না এবং যে সমুদয় আত্মীয় স্বজনগণ দেশে ছিলেন তাহাদের জন্যও স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা ও ক্রীতদাস-দাসী ফরগনা, খোরশান এবং কাশঘর ও পারস্যের বন্ধুস্বজনগণকে উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ভাবে মুক্ত হস্তে দান করিয়া অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা রাজ্যশান-সংরক্ষণের জন্য রাজকোষে সংগৃহীত হইয়াছিল।

বাবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ভীষণ গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইয়াছিল, এবং ভারতের

অনেক স্বাধীন নৃপতিগণ তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য বন্ধপরিকর হইলেন। দিল্লীর শাসনাধীন অনেক প্রদেশ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল না। আগ্রার চারিদিকে বিদ্রোহের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে বাবর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, —“আমি যখন আগ্রায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন গ্রীষ্মকাল, তারপর সহরে লোকজন একেবারেই ছিলনা, সকলে প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। সহরের লোকেরা আমাদিগকে ঘৃণা করিত এবং শত্রুতা করিয়া বিদ্রোহী হইয়া চুরি ও ডাকাতি করিতেও ইতস্ততঃ করিত না। আবার এমন আশ্চর্য্য যে এ বৎসর অতি গরম পড়িয়াছিল, অনেকে গ্রীষ্মের দরুণ উত্তাপে প্রাণ-বিসর্জজন করিয়াছিল।” ইহার ফলে বাবরের অনেক প্রধান প্রধান বীর যোদ্ধা এবং বেগ বিশেষ ভাবে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল এবং হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করিয়া মুহিবীর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের এইরূপ অসম্মতির কারণ দেখিয়া বাবর এক দরবার আহ্বান করিয়া সমস্ত বেগকে বলিলেন—“আমাকে যাহা বন্ধ বলে মনে করেন, আমি আশা করি তাহারা কেহ হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিবেন না। আর যদি কেহ আমাকে ত্যাগ করিয়া

যাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা যাইতে পারেন
আমি কোন বাধা দিব না।—তাঁহাদের কাছে এইরূপ
প্রস্তাব করিবার পর অসংখ্য ব্যক্তিগণ নীরব রহিলেন,
আর কেহ কোন কথা বলিলেন না।

বেগেরা ভারতবর্ষকে একেবারেই প্রীতির চক্ষে দেখিতেন
না। বাবর হিন্দুস্থান বিজয়ের পর খাজেকানান নামক
একজন সম্ভ্রান্ত বেগকে গজনির শাসনকর্তা নিযুক্ত
করেন। তিনি ভারতবর্ষ ভ্রাম্য করিয়া যাইবার সময় দিল্লীর
প্রাচীর গাত্রে লিখিয়াছিলেন—

If Safe and sound I pass the Sind,
Damned, if ever I wish for Hind ;
বিধি যদি দয়া করে সিন্ধু দেশটা করেন পার।

হিন্দুস্থান—সে মাথায় থাকুন,—

এ জীবনে ভাববোনা আর !

বাবর তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন—

“Return a hundred thanks to Babar,
for the bounty of the merciful God
Has given you Sind and Hind, and numerous
kingdoms ;

If, unable to stand the heat, you long
for cold,
You have only to recollect the frost and
cold of Ghazni.*

হাজার কুর্নিস জানাই আমি পরম দয়াল খোদার পায়,
সিন্ধু, হিন্দ সে সোণার রাজ্য পেলেম আমি ঝাঁরি দয়ার !
হিন্দুস্থানের দীপ্ত তপন যদিই বা হয় ! সহিতে নারি !
বরফ শীতল গজ্জনির কথা রইব মনে স্মরণ করি ।

এই ভাবে গোলযোগ মিটিয়া গেল বটে কিন্তু অশান্তি
আরম্ভ হইল অন্য দিক্ দিয়া—সে-কথাই এইবার বলিব !
বাবর বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন,
তিনি বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন যে সৈন্যগণের মধ্যে কোনরূপ
অসন্তোষের ভাব বিদ্যমান থাকিলে কার্য্য করা সম্বন্ধে
নানারূপ বিঘ্ন ঘটয়া থাকে । এজন্য অর্থ দ্বারা, মিষ্ট ব্যবহার
দ্বারা এবং নানারূপ কৌশল দ্বারা তিনি সৈন্যগণের মনস্তৃষ্টি
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই একদল
স্বাধীনতাপ্রিয় বীর রাজাদের সম্বন্ধে করিতে । প্রথম
অবস্থায় রাজধানীতে ও রাজ্যে মধ্যে যে অশান্তি ও
গোলযোগ ছিল তাহা নিবৃত্ত হইয়াছিল । তাঁহার শাসন-
দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়ণতা এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসন-ব্যবস্থা ধীরে-

ধীরে নগরবাসীদিগের প্রাণে আশার সঞ্চার করিল, তাহারা
বুঝিতে পারিল যে বাবর স্থায়ীভাবে এদেশ শাসন করিবেন
এবং এদেশেই বাস করিবেন, অশান্ত বিজ়েতাগণের স্থায়

নগরে শান্তি লুণ্ঠন, অত্যাচার এবং অবিচারই
প্রতিষ্ঠা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। এইরূপ

অবস্থায় দরুণ তাঁহাকে দীর্ঘকাল বিপন্ন অবস্থায় থাকিতে
হইল না, ধীরে ধীরে আবার গ্রামের লোকেরা গ্রামে
আসিল, দোকানদারেরা দোকান খুলিল, ব্যবসায়ীরা পূর্বের
ন্যায় ব্যবসা বাণিজ্যে মন দিল, আবার রাজধানী ধনধান্যে
পরিপূর্ণ হইল। *

* সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ম্যাক্সিসন্ বলেন—The firmness
of the conqueror was soon rewarded in a different
manner. No sooner did the inhabitants, Muha-
mmadan settlers and Hindu landowners and
traders, recognise that Babar intended his
occupancy be permanent, than their fears subsided.
Many proofs, meanwhile, of his generous and noble
nature had affected public opinion regarding
him. Everyday then brought accessions to his
standard. Villagers and shopkeepers returned to
their homes and abundance soon reigned
camp.

বাবর নিরাপদ এবং শান্তিপূর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মনোযোগী হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—“বিধাতার যদি আমাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায় না থাকে তাহা হইলে পৃথিবীর সকলেও যদি আমার শত্রু এবং বিদ্রোহী হয় তত্রাচ আমার একটা শিরাও কাটিতে সক্ষম হইবে না।

বাবর অল্প সময়ের মধ্যেই নিজ্জটক হইয়া হিন্দুস্থানের শাসনকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে সমরখন্দ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল, এইবার সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি হুমায়ুনকে সমরখন্দ জয় করিবার জন্য পাঠাইলেন কিন্তু হুমায়ুন কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।

বাবর পুত্র হুমায়ুনকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিতেন। হুমায়ুন সমরখন্দ হইতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া জনকজননার সমীপে সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবর এইরূপ ভাবে পুত্রের মিলনে কিরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন প্রেমস্বৰ্গে স্বরচিত জীবন-চরিতে নিম্নলিখিতরূপে লিখিয়াছেন—“আমি

† “Brandish the sword of the world as you may,
It can cut no vein if God Says, ‘nay’,

হুমায়ূনের মাতার সহিত হুমায়ূনের বিষয় আলাপ করিতে-
 ছিলাম এরূপ সময় হুমায়ূন আসিয়া উপস্থিত হইল।
 তাহার এইরূপ সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে আগমন করায়
 আমাদের হৃদয় গোলাপ-মুকুলের স্থায় প্রস্ফুটিত ও
 আমাদের নয়ন, প্রদীপের স্থায় উজ্জ্বল দীপ্তি লাভ করিল।
 ভোজনের সময় আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা আমর
 নিয়ম কিন্তু এই উপলক্ষে তাহার সম্মানার্থ ভোজের
 আয়োজন করিয়া তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে মর্যাদা প্রদর্শন
 করিয়াছিলাম। আমরা কিয়দিন এক সঙ্গে বাস
 করিয়াছিলাম।”

এইখানে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার
 পরও তাঁহাকে যে সমুদয় যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল
 সে কথা বিবৃত করিব। এসময়ে ভারতবর্ষে আরও কয়েকটা
 স্বাধীন মুসলমান ও হিন্দুরাজ্য ছিল। হিন্দুদের মধ্যে

চিতোরের রাণা সঙ্গ রাজপুত্রেরা বিশেষ প্রধান
 বা সংগ্রাম সিংহ ছিলেন। বাবর স্বার্থে দিল্লীর
 সিংহাসন অধিকার করিলেন,

তখন সংগ্রামসিংহ ছিলেন চিতোরের রাণা। বাবর দিল্লীর
 সিংহাসন অধিকার করিলে, তিনি বহু সৈন্য লইয়া বাবরকে
 আক্রমণ করিলেন। আগ্রার দশ ক্রোশ দূরে, শিক্রীর

মাঠে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। রাণা সাত্ৰাম সিংহের নেতৃত্বে সমস্ত রাজপুত শক্তি মিলিত হইয়াছিল। রাণা অসাধারণ বীর এবং দেশ-প্রেমিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজপুত জাতির আদর্শস্বরূপ বিবেচিত হইতেন। রাণাসিংহ “সমরশত-বিজয়ী” নামে প্রখ্যাত ছিলেন। যুদ্ধে তাঁহার একটা হাত ও চক্ষু গিয়াছিল, একখানি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং সর্ব্বাঙ্গে আশীটি আঘাত চিহ্ন ছিল। রাণাসিংহ বহু সৈন্য লইয়া বাবরকে আক্রমণ করিবার জন্য থানুয়ার মাঠে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। মুঘল সৈন্যেরা অগণিত রাজপুত সৈন্য দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িল।—তখন

বাবর সেনাপতিদ্বিগকে ডাকিয়া

থানুয়ার যুদ্ধ

বলিলেন—“জয় পরাজয় সমুদয়ই

ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, একদিন মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু কাপুরুষের মত মরিয়া লাভ কি? যদি মরিতে হয়, যুদ্ধেই মরিব। আমি ভীরা কাপুরুষের মত পলায়ন করিব না।” তাঁহার এই উৎসাহ-বাণীতে সৈন্যদের প্রাণ নবোৎসাহে বলীয়ান হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ চিত্তে মুঘলসৈন্যেরা রাজপুতগণকে আক্রমণ করিল। বাবর নিজে অতিরিক্ত সুরাপায়ী ছিলেন, তিনি শপথ করিলেন যে জীবনে আর কখনও সুরাপান করিবেন না। তিনি নিজ হস্তে সমুদয়

সুরাপাত্র ভাজিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। নবোৎসাহে

সুরাপান পরিত্যাগ করিয়া বলীয়ান্ মুঘলসৈন্যেরা ভীম
বিজ্ঞমে রাজপুতদিগকে আক্রমণ

করিলেন। মুঘলদের কামানের গোলার কাছে রাজপুতেরা
দাঁড়াইতে পারিলেন না। সংগ্রামসিংহ পরাজিত হইয়া
চিত্তে ফিরিয়া গেলেন। এই পরাজয়ের পর তিনি
মাত্র দুই বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। উদয়পুরের
নিকট আজও তাঁহার সমাধি-মন্দির আছে।

বাবর এই ঘটনার পর তিন বৎসর মাত্র জীবিত
ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে।

১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে
বাবরের মৃত্যু ও চরিত্র হুমায়ুন প্রবল স্বর রোগে

আক্রান্ত হন। আগ্রার সুনিপুণ এবং সুবিখ্যাত চিকিৎ-
সকেরা প্রাণপণ যত্ন দ্বারা কিছুই করিতে পারিলেন না।
বাবর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রিয়তম পুত্রের জীবন-
রক্ষার জন্য বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। এই
সময়ে বাবরকে একজন দরবেশ বলিলেন—যদি কেহ
যুবরাজের জন্য প্রাণ দেন তাহা হইলে তাঁহার জীবন রক্ষা
হইতে পারে। বাবর বলিলেন—“আমার প্রিয় পুত্রের
জীবন-রক্ষার জন্য আমিই আমার প্রাণ দিব।” এইরূপ

বলিয়া বাবর পুত্রের শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ভগবানের নিকট পুত্রের আরোগ্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে হুমায়ূনের শয্যার চারিদিক তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন,—“আমি ব্যাধি গ্রহণ করিলাম, আমি ব্যাধি গ্রহণ করিলাম।” ফলে তাহাই হইল! সেদিন হইতে হুমায়ূন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। আর বাবর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সত্য সত্যই হুমায়ূন আরোগ্য লাভ করিলেন। এবং সেই রোগে বাবর প্রাণত্যাগ করিলেন। *

বাবর মৃত্যুর পূর্বে সাম্রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিদিগকে তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে আহ্বান করিয়া হুমায়ূনকে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন—“আশা করি, আপনারা হুমায়ূনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবেন এবং বন্ধুর ন্যায় তাঁহার রাজকর্মের সাহায্য করিবেন।” হুমায়ূনকে বলিলেন—“আমি তোমাকে ও আমার সমুদয় আত্মীয়বন্ধুবান্ধবগণকে ঈশ্বরের হস্তে নাস্ত করিয়া চলিলাম। তুমি তোমার ভ্রাতার প্রতি দ্রব্যবহার করিবে না।” ইহাই মহাপ্রাণ বাবরের জীবনের শেষ

কথা। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর বাবর পরলোক গমন করিলেন। আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব এবং সমস্ত নরনারী তাঁহার মৃত্যুতে শোকার্ত হইয়াছিলেন। বাবরের অতি প্রিয়তম বন্ধু খাঁজা কালন্ তাঁহার মৃত্যুজনিত শোকে বিহ্বল চিত্তে নিব্বিহ্বল হইয়াছিলেন—

Alas ! that time and the changeful heaven
Should exist without thee ;
Alas ! and Alas ! that time should remain
and thou shouldst be gone.

হুনিয়াটা রইবে অটল রইবে সবি ছিল যেমন
তুমি শুধু বন্ধু আমার ! অজানা দেশে করলে গমন !
কালস্রোত বইবে সদাই রইবে ধরা যেমন ছিল !
আসবেনা আর শুধুই তুমি কাল তোমার যে সবই নিল।”

বাবরের লিখিত আদেশ ছিল যে মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার শবদেহ যেন কাবুলে স্থানান্তরিত করিয়া সমাহিত করা হয়। তাঁহার এই আদেশ প্রতিষ্ঠানিত হইয়াছিল। কাবুলের এক পরম রমণীয় দিৱ্য স্থান এক প্রফুল্ল কুসুমসুবাসিত উদ্যানে তাঁহার সমাধি বিরাজিত। নদীর ধারা সে উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া চলিয়াছে—পাখীরা

সেইখানে মনের আনন্দে গান করে। স্বাত্রিগণ ধলে ধলে
 প্রকৃত সেখানে উপস্থিত হইয়া পরলোকগত আত্মার
 উদ্দেশে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। তাঁহার সমাধির
 উপর কোন আবরণ নাই! নীল আকাশের তলে তাঁহার
 সমাধি-শয্যা—মর্ম্মর প্রস্তর নির্মিত সুন্দর মন্দির—শাস্ত,
 নির্জন, ও কমনীয়। এই সমাধির উপরে যে খোদিত লিপিটি
 আছে তাহা সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরচিত। তাহা
 এইরূপ—

A Ruler from whose brow shone the Light
 of God, was that Backbone of the faith,
 Muhammad Babur Padsha. Together with
 majesty, dominion, fortune, rectitude, the
 open hand and the firm Faith, he had shone
 in prosperity, abundance, and the triumph of
 victorious arms. He won the material world
 and became a moving light; for his every
 conquest he looked, as for Light, towards the
 World of souls. When Paradise became his
 dwelling, and Ruzwan [door-keeper of
 paradise] asked me the date, I gave him for

answer—"Paradise is for ever Babur Padshah's abode."

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের প্রতি তাঁহার অধস্তন বংশধরেরা বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। শাহজাহান তাঁহার সমাধি-মন্দিরের মিকট একটি মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন আর জাহাঙ্গীর খোদিত লিপি স্থাপন করিয়া তদীয় আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিয়াছিলেন। বাবরের মৃত্যু-সময়ে তাঁহার মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি দুই কারণে মানবসমাজে চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। প্রথমতঃ তাঁহার ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার আত্মজীবন চরিত। এই গ্রন্থখানা তাঁহার অমর কীর্তি। বাবর সরলহৃদয় সদাপ্রফুল্ল, সাহসী, তেজস্বী, প্রতিভাশালী এবং আত্মীয়স্বজনগণের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁহার জীবন নানা দুঃখের ভিত্তি দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে, তবু তিনি একদিনের জন্যও নিরাশ বা ভগ্নহৃদয় হন নাই। ক্ষমা ছিল তাঁহার চরিত্রের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি অতি বড় শত্রুকেও মার্জনা করিয়াছেন। বাবর কবি ছিলেন, পারস্য ও তুর্কী ভাষায় তিনি অনেক কবিতা রচনা করিয়াছেন। এই সকল কবিতা শব্দ-সম্পদে

এবং ভাষার মাধুর্য্যে প্রসিদ্ধ। স্থপতিবিদ্যায় এবং কৃষিকার্য্যে তাঁহার দক্ষতা ছিল। তিনি উদ্যান-বাটি নির্মাণ করিতে এবং প্রাসাদ নির্মাণকার্য্যে পর্য্যবেক্ষণ করিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি বড় বেশি শাস্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে পারেন নাই। অতি শৈশব হইতেই তাঁহাকে অসিহস্তে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞানানুরাগ ছিল। শারীরিক বলও ছিল বাবরের অসাধারণ। তিনি লিখিয়াছেন—“আমি আমোদের জন্য গঙ্গানদী সম্ভরণ পূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইয়াছি। অভিযান-কালে যে সকল নদী আমার সম্মুখে পতিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক গঙ্গা ব্যতীত আর সকল নদীই সম্ভরণ করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছি। বাবর একাদিক্রমে চল্লিশ ক্রোশ অশ্ব-পৃষ্ঠে গমন করিতে পারিতেন।

সঙ্গীতানুরাগ এবং সুরাপান প্রবৃত্তি তাঁহার এত বেশি ছিল যে তিনি বন্ধুগণের সহিত কি ভাবে মত্তপান করিতেন সে সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অতিরিক্ত সুরাপানের দরুন কোন কার্য্যে তিনি পণ্ড করেন নাই। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে রাণা সঙ্কর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইয়া তাঁহার মনে হইল যে, সুরাপান ইসলাম ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ। যে মুসলমান, শাস্ত্রের বিধান অমান্য করিয়া চলে

তাহার প্রতি বিধাতা অপ্রসন্ন হইয়া থাকেন—এইজন্য তিনি মত্তপান পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন এবং তৎকণাৎ স্বর্ণ রৌপ্য নির্মিত পান পাত্রাদি খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দীন দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন। বাবর তাহার সুরাপান ভ্যাগের ঘটনাটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য প্রজাদিগকে তমখা [Stamp Tax] হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

বাবর তাহার হিন্দুস্থান বিজয়ের পর শাসন সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা এবং শৃঙ্খলা বিধানের পূর্বেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, কাজেই ভারতবর্ষের শাসন-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারেই তাহার প্রতিভা বিকশিত হইবার সুযোগ ঘটে নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

—)%(—

হুমায়ুন ও শেরশা

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নাশেরউদ্দীন মুহম্মদ হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ুন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অমুরাগ ছিল। তিনি ফলিতজ্যোতিষের আলোচনা করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বাবরের কামরান, হিন্দোল ও মিরজা আফরী নামে আরও তিন পুত্র ছিল, কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র হুমায়ুনকেই সাম্রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। হুমায়ুন পিতার মৃত্যুকালীন আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। তিনি ভ্রাতা কামরানকে কাবুল ও পঞ্জাব প্রদেশের অধিকার প্রদান করিলেন। কাবুল রাজ্যকে এই হুমায়ুনের ব্রাহ্মপ্রিয় ভাবে ভারতমুখ্য হইতে নিচ্ছিন্ন করা হুমায়ুনের সুবিবেচনার ফল হয় নাই। এই ব্যবস্থায় তাঁহাকে পরে বিশেষ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, কেননা এসকল প্রদেশ হইতে মুঘলেরা সৈন্য সংগ্রহ

ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতেন। এ সময়ে ভারতবর্ষে ভাল করিয়া মুঘল প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কাজেই হুমায়ুনকে নানা যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে হইল। কামরানকে কাবুল ও পঞ্জাব রাজ্যদান করিয়া তিনি অন্তর্বিদ্বেহ দূর করিবার নিমিত্ত হিন্দোলকে সম্বলের এবং মির্জা আকরীকে মেওয়াতের শাসন-কর্তৃত্ব প্রদান করিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই হুমায়ুনের জীবন নানারূপে বিপদাপন্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিয়া রাজসভার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, কথাটা প্রকাশ পাইলে পর ঐ ব্যক্তি বার্থমনোরথ হইয়া গুজরাটের স্বাধীন মুসলমান অধিপতি বাহাদুরশাহের শরণাপন্ন হইলেন। হুমায়ুন তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বাহাদুরশাহকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াও বার্থকাম হইলেন। বাহাদুরশাহ শরণাপন্ন ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

এদিকে আর এক ঘটনা ঘটিল। দিল্লীর আফগান বংশীয় শেষ নৃপতি ইব্রাহিম লোদী পিতৃব্য আলাউদ্দীন ও বাহাদুরশাহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাহাদুর শাহের পূর্ব পুরুষেরা লোদী বংশীয়দের সাহায্যে উন্নতিলাভ

করিয়াছিলেন বলিয়া বাহাদুরশাহ আলাউদ্দীনের প্রতি
 বিশেষ সম্মান প্রদান করিলেন এবং
 গুজরাটের বাহাদুরশাহ তাঁহারি প্ররোচনায় এক বিপুল
 সৈন্যবাহিনী স্বীয় পুত্র তাতার খাঁর অধীনে
 হুমায়ূনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হুমায়ূন—এই
 শত্রুদলকে সহজেই পরাজিত করিলেন, তাতার খাঁ যুদ্ধে
 নিহত হইলেন। এইবার তিনি বাহাদুরশাহকে দমন
 করিবার জন্য সৈন্যে অগ্রসর হইলেন এবং বাহাদুরশাহকে
 যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গুজরাট জয় করিতে সমর্থ হইলেন।
 গুজরাট বিজয় করিয়া হুমায়ূন বাহাদুর শাহের গুপ্তধন-
 বাশি লুণ্ঠন করিতে পারিয়া এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন
 যে তিনি প্রত্যেক সৈনিককে একতাল পরিমিত স্বর্ণ ও
 রৌপ্য মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।

গুজরাট-বিজয়ের পর তাঁহাকে শীঘ্রই রাজধানীতে
 ফিরিয়া আসিতে হইল, কেননা দীর্ঘকাল দূরে অবস্থান করায়
 রাজ্য মধ্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। একজন
 ভ্রাতা মির্জা আফরীর উপর গুজরাটের শাসন ভার
 অর্পণ করিয়া তিনি রাজধানীর অভিমুখে প্রত্যাবর্তন
 করিলেন। হুমায়ূন গুজরাট পরিত্যাগ করিবার পরেই
 মুঘলগণ আক-কলহ দ্বারা বিশেষ ভাবে হীনবল হইয়া

পাড়িলেন এক সুযোগ পাইয়া বাহাদুর শাহ পুনরায় গুজরাট অধিকার করিয়া লইলেন।

হুমায়ুন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিতে পাইলেন—আফগান বংশীয় শেরখাঁ, মুঘল সাম্রাজ্য অধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন।

শেরখাঁর পরিচয় ও বীরত্ব

শেরখাঁর পরিচয় এইরূপ। ইঁহার প্রকৃত নাম ফরিদ। শেরের পিতামহ ইব্রাহিম খুর ভারতবর্ষে আসিয়া দিল্লীর অন্তর্গত হিস্‌সারে ফিরোজা নামক স্থানে বাস করেন। এই স্থানে আনুমানিক ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ফরিদের জন্ম হয়। শেরখাঁর পিতা হোসেন স্বীয় কমতাবলে সাসারাম ও তাণ্ডার জাইগীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শেরখাঁ বাল্যকালে কিছুদিন জৌনপুরে বিদ্যাশিক্ষা করেন। পিতা ইহাকে একটা জাইগীর দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রিমাতার প্ররোচনায় সেই জাইগীর হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। পিতৃশ্নেহ ও জাইগীর হইতে বঞ্চিত হইয়া ফরিদ আগ্রা যাইয়া সম্রাট বابرের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে পৈত্রিক জাইগীর পুনরায় কিরিয়া পাইয়াছিলেন।

শেরখাঁ মুঘল শিবির পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বিহারে আগমন করেন। বিহারের শাসনকর্তা সুলতান মামুদ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পরেই সুলতান মামুদের মৃত্যু হইলে তাঁহার নাবালক পুত্র জামাল খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজমাতা সুলতানা দাছ প্রতিনিধি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শেরখাঁর উপর রাজ্যশাসন সম্পর্কিত অনেকটা ভার হস্ত করেন। সুলতানা দাছর মৃত্যুর পর শেরখাঁ বিহারের নাবালক শাসনকর্তার প্রতিনিধি হইয়া বিহার রাজ্যের সর্বের সর্বব্যবস্থা উদ্বাহিত করেন। এ সময়ে চুনারের দুর্গের অধিকারিণী মালিকা নামে এক বিধবা রমণীকে বিবাহ করিয়া শেরখাঁ প্রচুর ধনরত্নের সহিত ঐ দুর্গেরও অধিকারী হইলেন। বিহারের নাবালক শাসনকর্তার উপর শেরখাঁর অসাধারণ প্রভাব দেখিতে পাওয়ায় বিহারের ওমরাহগণ শেরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন। বিহারের বিদ্রোহী সৈন্যদল সংখ্যায় বেশী হইলেও শেরখাঁ তাহাদিগকে সুরজগড়ের যুদ্ধে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের পর শেরখাঁ বঙ্গের রাজধানী গৌড়নগর আক্রমণ করেন। বঙ্গদেশের রাজা উপদৌকন ইত্যাদি দিয়া তাঁহাকে শাস্তি করিয়াছিলেন।

হুমায়ুন ও শেরখাঁ

এ-সময়ে হুমায়ুন গুজরাটের বিদ্রোহ-দমনে বিব্রত ছিলেন, কাজেই শেরখাঁর পক্ষে বিশেষ স্বেযোগ ঘটিয়াছিল। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে শেরখাঁ পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে, হুমায়ুন শেরখাঁকে পরাজিত করিতে এবং বঙ্গদেশ অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া চুনার দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলেন। শেরখাঁ তাঁহার অধীনে দুর্গ শাসন করিতে স্বীকৃত হওয়াতে এবং গুজরাট যুদ্ধের জন্যই সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করা আবশ্যক হইয়া, পড়াতে বাদশাহ চুনার পরিত্যাগ করেন।

এইবার স্বেযোগ বুঝিয়া শেরখাঁ আফগানদিগকে সৈনিক শ্রেণী ভুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যদি কোন আফগান সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইতে অস্বীকার করেন তবে তাঁহার প্রাণদণ্ডের বিধান করিবেন এইরূপ ঘোষণা করিয়া তিনি আফগান শক্তি হ্রাস ভাবে পুনর্গঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আফগান সেনার সাহায্যের জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন, কাজেই দলে দলে আফগানসেনা আসিয়া তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইতে লাগিল—

এইভাবে শেরখাঁ একদল ক্ষমতাশালী রণানুশীল আফগান সেনার সর্ববয়স্ক কর্তা হইয়া পড়িলেন।

১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শেরখাঁ পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলে, হুমায়ুন শেরখাঁকে পরাজিত করিতে এবং বঙ্গদেশ অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া চুনার দুর্গের অধিকারে অগ্রসর হইলেন। হুমায়ুন চুনার দুর্গ অধিকার করিলেন এবং পরিশেষে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বঙ্গদেশের সুলতান মুহম্মদশাহ শেরখাঁ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পাটনার নিকটবর্তী স্থানে বাদশাহ হুমায়ুনের নিকট আপনার পরাজয়ের ভীষণ দুর্দশার কাহিনী বর্ণনা করিলেন। বাদশাহ তাঁহার দুর্দশার কাহিনী শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শেরখাঁ বাদশাহের আক্রমণ-গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলেন—তাঁহার সৈন্যের পরাজয় বাক্তা জানিতে পারিয়া, পূর্ববর্তী কুপতিগণ যে ধনরাশি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা সংগ্রহ করিয়া গোড়নগর পরিত্যাগ পূর্বক পৈত্রিক জাইগীর শেসারামে প্রস্থান করিলেন। হুমায়ুন—কোনরূপ বাধা বিঘ্ন ব্যতিরেকে অতি সহজেই গোড়নগর অধিকার

করিয়া আপনার নামে খোত্বা ও শিকা প্রচলিত করিলেন।

হুমায়ুন বাদশাহ বঙ্গদেশ বিজয় করিয়া আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-কৌতুকে নিমগ্নিত হইলেন। এদিকে শেরখাঁ পিতৃ জায়গীরে উপনীত হইয়া হুমায়ুনকে পরাজিত এবং তাঁহার বিনাশের জন্য নানা উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমতঃ শেরখাঁ রোটাশ দুর্গ অধিকার করিয়া দুর্গ মধ্যে বহুকাল সঞ্চিত ধনরাশি লাভ করিলেন। রোটাশ দুর্গ জয় করিয়া শেরখাঁ পরিবারবর্গের জন্য নিরাপদ স্থানের সংস্থান করিতে পারিলেন। তাঁহার এই বিজয়ে তদীয় বন্ধুগণও বিশেষ উৎসাহিত হইয়া সকলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এই বার শেরখাঁ ধন-সম্পদে এবং শক্তি-সঞ্চয়ে অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইয়া হুমায়ুনকে আক্রমণ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এদিকে বঙ্গদেশে বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে মুঘল সৈন্যেরা জলবায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল। অশ্ব, উষ্ট্র ও অন্যান্য ভারবাহী জীবজন্তু মৃত্যু-

মুখে পতিত হইতে লাগিল। এই সময় হুমায়ূন জানিতে পারিলেন যে শাহজাদা হিন্দাল কুচক্রী অমাত্যগণের ষড়যন্ত্রে পরিচালিত হইয়া বিদ্রোহী হইয়াছেন এবং বিশ্বস্ত রাজপুরুষদ্বয়কে হত্যা করিয়া নিজের নামে খোত্বা প্রচারিত করিয়াছেন এবং কামরান্ সৈন্যে আগ্রার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ভ্রাতাগণের এই বিদ্রোহের সংবাদ জানিতে পারিয়া হুমায়ূন চিন্তিত হইলেন এবং জাহাঙ্গীর কুলিবেগ নামক একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বাঙ্গালার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিয়া রাজধানী আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন।

শেরখাঁ এইবার বুঝিলেন যে তাঁহার প্রার্থিত সুযোগ উপস্থিত। মুঘল সৈন্যেরা রোগ ভোগ করিয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, ওদিকে বাদশাহও ভ্রাতাগণের বিদ্রোহ-দমনের জন্য রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। শেরখাঁ চৌশা নামক স্থানে উপনীত হইয়া মুঘল সৈন্যের গতি রোধ করিলেন। কাজেই মুঘলসৈন্যদের সেখানে তিনমাস অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তার পর শেরখাঁ শত্রুর প্রস্তাব করিলেন এবং কোরাণ ছুইয়া শপথ করিলেন যে, তিনি সম্রাটের নামে খোত্বা এবং শিক্ষা প্রচলিত রাখিয়া বঙ্গদেশ ও বিহার

শাসন করিবেন। মুঘল সৈন্যেরা এবং বাদশাহ শেরের অঙ্গীকারে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন এবং পূর্বের স্ত্রীর আর সতর্ক রহিলেন না। শেরখাঁ একদিন প্রাতঃকালে হঠাৎ মুঘলদিগকে আক্রমণ করিলেন। মুঘল সৈন্যেরা যুদ্ধের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলনা। কাজেই তাহাদের অতি শোচনীয় দুর্দশা উপস্থিত হইল। হুমায়ুন গঙ্গানদী পার হইবার জন্য যে সকল নৌকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন আকগান সেনারা তাহা হস্তগত করিয়াছিল। বিশ হাজার মুঘল সৈন্য নদীগর্ভে প্রাণ হারাইল। হুমায়ুন প্রাণরক্ষার জন্য নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এক ভিস্তি তাহার বাহুপূর্ণ মশকের সাহায্যে তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল। মুঘল সৈন্যেরা পরাজিত হইল। এমন কি হুমায়ুনের বেগম এবং অন্যান্য পুরমহিলারা পর্যাস্ত শেরখাঁর হস্তে বন্দি হইয়াছিলেন। শেরখাঁ তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক হুমায়ুনের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই ভাবে মুঘল সৈন্যদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শেরখাঁ বঙ্গদেশে গমন করিলেন। তিনি বঙ্গদেশে গমন করিয়া জাহাঙ্গীর কুলিবেগকে শিবিরে আশ্রয় করিয়া পাত্রমিত্র সঙ্গে করিয়া নিজ নামে খোত্বা এবং শিক্কা প্রচলিত

করিয়া বাঙ্গালা ও বিহার শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন—এবং শাহ উপাধি ধারণ করিলেন। শেরশাহ বঙ্গদেশের শাসন ক্ষমতা সুসম্পন্ন করিয়া মুঘল সাম্রাজ্য অধিকার করিবার জন্য মনোযোগী হইলেন। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে শেরশাহ বিপুল সৈন্য লইয়া আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং গঙ্গার আশে পাশের সমুদয় প্রদেশ অধিকার করিলেন। বাদসাহ এই সংবাদ পাইয়া একলক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যসহ কনোজের নিকটে গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া আফগান সৈন্যের গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষই প্রথমতঃ আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এ-সময়ে বর্ষাকাল সমাগত হইয়াছিল, হুমায়ূনের শিবির জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল, কাজেই আর সময় নষ্ট না করিয়া তিনি শেরশাহের সৈন্য আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে হুমায়ুন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন এবং নিরুপায় হইয়া লাহোরে কামরাণের নিকট যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শেরশাহ মুঘল সৈন্যদিগকে সেখানেও পরাস্ত করিলেন। কামরান্ শেরশাহ সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাকে পঞ্জাব রাজ্য অর্পণ করিয়া কাবুলে চালাইয়া গেলেন।

এদিকে হুমায়ুন গৃহহারা ও একান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। তিনি সিন্ধু ও মাদোয়ারের রাজা

মালদেবের সাহায্য প্রার্থী হইলেন, কিন্তু কোন সাহায্য
 পাইলেন না। বরং এই দুষ্ক-
 হুমায়ুনের নিরাশ্রয়
 অবস্থা
 বুদ্ধি নৃপতি তাঁহাকে বন্দী করিয়া
 শেরশাহের হস্তে অর্পণ করিবার
 সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। হুমায়ুন দৈবাৎ এই
 দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে অমর-
 কোটের দিকে প্রস্থান করেন।

নিরুপায়, নিরাশ্রয় নৃপতিকে সামান্য কয়েকজন অনুচরসহ
 সিন্ধুদেশের ভীষণ মরুভূমির মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল।
 এই সময়ে তাহাদের যে কি ভীষণ কষ্ট হইয়াছিল তাহা
 বর্ণনাতীত। জলতৃষ্ণা সহ্য করিতে না পারিয়া ঘুঘলেরা
 চাৎকার করিতেছিল, কেহ কেহ জিহ্বা বাহির করিয়া
 ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছিল। একটী কূপের পার্শ্বে
 উপনীত হইলে জল তুলিবার অবসরটুকু কেহ সহ্য করিতে
 না পারিয়া দড়ি ছিঁড়িয়া জলোত্তলকপাত্র কূপমধ্যে পতিত
 হইলে ঐ সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন তৃষ্ণাতুরও কূপের মধ্যে
 পড়িয়া গিয়াছিল। এইরূপ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া মাত্র
 সাতজন অনুচরসহ বাদশাহ অমরকোট উপনীত হইতে
 পারিয়াছিলেন। অমরকোটের রাজা হুমায়ুনকে সাদরে
 গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত উদার ব্যবহার দ্বারা

প্রীত করিয়াছিলেন। হুমায়ুন অমর কোটে প্রায় ছয়মাস কাল অবস্থান করেন। অমরকোটের রাজা বাদসাহকে দুই হাজার সৈন্য দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। হুমায়ুন পরিবারবর্গকে অমরকোটে রাখিয়া রাজপ্রদত্ত সৈন্য লইয়া সিন্ধুদেশে অধিকার করিতে আকবরের জন্ম গমন করেন। অভিযানের দ্বিতীয়

দিন তিনি এক সরোবর-তীরে সৈন্যে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন এমন সময়ে আকবরের জন্ম সংবাদ পাইলেন। এই সংবাদে প্রীত হইয়া তাহার ওমরাহগণ রাজার নিকট উপস্থিত হইলে হুমায়ুন তাহার ভৃত্য জহোরকে তাহার নিকট যে সকল দ্রব্য ছিল তাহা আনয়ন করিবার জন্ত আদেশ দিলেন। জহোর দুইশত মুদ্রা, একখানি রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার এবং একটী নুগনাভি কস্তুরী আনয়ন করিল। বাদশাহ মুদ্রা ও অলঙ্কার প্রতাপণ করিয়া কস্তুরীর দানা সমাগত বন্ধুবর্গকে বিতরণ করিলেন। তারপর তিনি করুণ কণ্ঠে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“বন্ধুগণ! আমার পুত্রের জন্মোপলক্ষে তোমাদিগকে উপহার দিবার জন্ত আমার কেবল মাত্র একটী কস্তুরী আছে, এই কস্তুরীর মধুর সৌরভে চারিদিক পূর্ণ হইয়াছে; আমি আশা করি, আমার এই পুত্রের

যশঃ সৌরবে একদিন সমগ্র পৃথিবী গৌরবান্বিত হইবে।'

হুমায়ুনের দুর্গাভির পরিসমাপ্তি এখানেই হইল না। ইতিমধ্যে তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। তারপর সিন্ধুর রাজার সহিত যুদ্ধেও পরাজিত হইলেন। তখন নিরুপায় হুমায়ুন কান্দাহারের দিকে পলায়ন করিলেন। পথে—বীরবর বৈরামখাঁ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এই সময়ে হুমায়ুনের ভ্রাতা মিরজা আশ্বরী কান্দাহারে কামরাণের প্রতিনিধিরূপে শাসন করিতেছিলেন, তিনি হুমায়ুনকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক বরং নানা ভাবে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পর্যুদস্ত করিয়া তুলিলেন।

এইবার হুমায়ুন পারস্তের দিকে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন।—তিনি যখন কিস্তানের সীমানার উপনীত হইলেন, তখন পারস্তের রাজার পক্ষ হইতে কিস্তানের শাসনকর্তা তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন। হুমায়ুন হিরাটে গমন করিলেন। হিরাটে পারস্ত নৃপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র সসম্মানে অভিনন্দিত করিলেন—মোহাম্মদ বিশেষ সমাদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া পারস্য দরবারে পৌঁছিবাব উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা

করিয়া দিলেন। যথা সময়ে হুমায়ুন পারস্যদরবারে উপনীত হইলেন—পারস্যের রাজা অত্যন্ত সম্মানের সহিত তাঁহাকে স্বীয় দরবারে গ্রহণ করিলেন।

শেরশাহের পাঠান শক্তির প্রতিষ্ঠা

এদিকে হুমায়ুনকে পরাজিত করিয়া শেরশাহ সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া বঙ্গ, বিহার, ও উত্তর পশ্চিম ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিশেষ ১৫৬০ সন সহিত রাজ্যাশাসন করিতে লাগিলেন। শেরশাহ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া একে একে রাজপুতনা, মালব, বুদ্ধেলখণ্ড প্রভৃতি জয় করিতে চেষ্টা করেন এবং অধিকাংশস্থলে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

রাজপুতনার অন্তর্গত মাড়োয়ার রাজ্য অধিকার করিতে যাইয়া তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। স্বদেশভক্ত মাড়োয়ারগণ বিশেষ বীরত্বের সহিত তাঁহার সন্ধিযুদ্ধ করিয়াছিল। মাড়োয়ার অভিযানে তিনি আশী হাজার সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। মাড়োয়ারিদের আক্রমণে আফগান সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বহুকষ্টে শত্রু সৈন্য পরাস্ত হইলে শেরশাহ মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত অনুর্বর মাড়োয়ার রাজ্যকে লক্ষ্য করিয়া

বসিয়াছিলেন—“আমি এক মুষ্টি ভুট্টার জন্য ভারতমাত্রাজ্য হারাইতে বসিয়াছিলাম।”

১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শেরশাহ বৃন্দেনখণ্ডের অন্তর্গত কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিলেন। এই দুর্গ অবরোধ করিবার সময়ে ভূগর্ভস্থ বাকুদখানায় শেরশাহের মৃত্যু ভীষণ আঘাত ঘটে, সেই অগ্নিতে তাঁহার সারাদেহ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুর্গ অধিকৃত না হইয়াছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন—যখন শুনিলেন দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে তখন একটা মাত্র বাণী তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!—তারপর চিরদিনের জন্য তাঁহার বাকশক্তি রুদ্ধ হইল। শেরশাহের অমর আত্মা অনন্তকালের জন্য দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রয়াণ করিল।

শেরশাহের চরিত্র ও রাজ্যশাসন প্রণালী

শেরশাহ একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার হৃদয় উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ছিল। তিনি আপনার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোনরূপে অসদাচরণ করিতেই ইতস্ততঃ করিতেন না। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার ন্যায় প্রজারঞ্জক ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ভারতবর্ষের মধ্যযুগের

ইতিহাসে বিরল। তিনি রাজ্য শাসনের অনেক সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক প্রদেশগুলি অনেক সরকারে ভাগ করেন, সরকারগুলি আবার অনেক পরগণায় বিভক্ত করেন। এইভাবে শেরশাহ তাঁহার সাম্রাজ্যকে ১১৬০০০ হাজার পরগণাতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তিনি এই সকল পরগণা ও সরকারের শাসন-কার্য্য নির্বাহের জন্য এক একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন, আইন লিখিবার ব্যবস্থা করেন ও ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের সমুদয় জমি জরীপ করেন। মোট উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ জমির খাজনা স্বরূপ নির্দিষ্ট হয়। প্রজারা ক্ষেতের ফসল দিয়া কিংবা অর্থ দ্বারা খাজনা দিতে পারিত।

শেরশাহ মাত্র পাঁচ বৎসর কাল দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রজা-সাধারণের হিত সাধন করে তিনি যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন এখনও তাহা বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি বঙ্গদেশ হইতে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত একটা প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ পথের দুই পাশে স্থানে স্থানে সরাইখানা ও কূপ ছিল। পথের দুই ধারে অল্প দূরে, দূরে হিন্দু ও

মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র সরাইখানার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজকার্য ও বাণিজ্যের নৌক্যার্থ ঘোড়ার ডাকের স্থিতি হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্ব কালে দস্যু ও তস্করের ভয় সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রবল প্রত্যাপে কেহই বিদ্রোহী হইতে সাহসী হয় নাই। অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য তিনি অত্যন্ত কঠোর নীতি অবলম্বন করিতেন। জমির মাপ সম্বন্ধে শেরশাহ যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন পরবর্তীকালে আকবরের রাজত্বকালেও কতকটা সেই নীতি পরিগৃহীত হইয়াছিল। শেরশাহ স্থপতি বিদ্যামুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁহার জীবদ্দশাতেই সাসারামে যে সৌকটবশালী সমাধিগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপিও স্থপতি-বিদ্যার অদ্বুত নিদর্শনরূপে পরিচিত।

শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইশলামশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইশলামশাহের ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। তিনি যে সাতবৎসর রাজত্ব করেন সে কয় বৎসর কেবল বিদ্রোহ দমন করিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। ইশলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার শিশু-পুত্র সিংহাসনে বসিলেন। এ সময়ে মুহম্মদ আদিল শাহ বা আদিল ঐ শিশুকে হত্যা করিয়া আদিলশাহ নাম লইয়া

সিংহাসনে বসিলেন। হিমু নামক একজন নীচজাতীয় হিন্দু বেনিয়া এ সময়ে আদিলের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। হিমুর মন্ত্রণাবলে আদিল নানা অত্যাচার করিয়া চারিদিকে বিদ্রোহ ঘটাইয়াছিলেন। বল ও মালব স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। শেরশাহের এক আত্মপুত্র পঞ্চাবে আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। দিল্লী ও আগ্রা পর্যন্ত বিদ্রোহীদের হাতে পড়িল।

হুমায়ূনের পুনরায় রাজ্য অধিকার

এই সমুদয় সংবাদ হুমায়ূনের অশ্রুতে ভরপুর ছিল না। পারস্যের রাজা হুমেশ্ কাবুল ও কান্দাহার জয় করিবার জন্য নির্বাসিত বাদশাহের অধীনে ১৪০০০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি এই সৈন্য দলের সাহায্যে বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতা কামরানকে পরাজিত করিয়া কাবুল ও কান্দাহার জয় করিয়া শীঘ্রই দিল্লী অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজ্যচ্যুত কামরানকে হুমায়ূন বন্দী করিয়া তাঁহার চন্দ্রবদন উৎপাটিত করিয়া দিয়াছিলেন। [১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাইমাসে] এই যুদ্ধে বৈরাম খাঁ তাহাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়া ছিলেন। দ্বিতীয়বার দিল্লী সিংহাসন অধিকার করিয়া

হুমায়ূন অতি অল্প দিন জীবিত ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় হুমায়ূন পাঠগৃহ হইতে নীচে নামিবার সময় সিঁড়ি হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃতদেহ যমুনার তীরে সমাহিত হয়। হুমায়ূনের মৃত্যুকালে মাত্র এক পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হুমায়ূন পরলোক গমন করেন। হুমায়ূনের সমাধি-মন্দির দিল্লীর একটি প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। হুমায়ূন দেখিতেও যেমন সুপুরুষ ছিলেন, তেমনি সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্য, জ্যোতিষ, ও অস্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। হুমায়ূনের জীবন উপন্যাসের ন্যায় কোতূহলোদ্দীপক ও রহস্যপূর্ণ। বিপদের পর বিপদ তাঁহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে তথাপি তিনি কর্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। হুমায়ূনের ভ্রাতৃস্নেহ অসীম। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ তাঁহার জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিলেও তিনি তাহাদের প্রতি তেমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এমন কি কামরাণের ন্যায় নিষ্ঠুর প্রকৃতির ও বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতার প্রাণদণ্ড বিধানের জন্য ওমরাহগণ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও তিনি ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই। অবশেষে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কামরানকে অন্ধ করিবার অমুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

হুমায়ূন মদুসভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। পরোপকার করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার সম্ভাবসিদ্ধ ছিল। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট যথেষ্ট সমাপরলাভ করিতেন। মুঘলজাতির প্রকৃতিগত নিষ্ঠুরতা তাঁহার চরিত্রে বিদ্যমান ছিল না।

চতুর্থ অধ্যায়

আকবর বাদশাহ

হুমায়ূনের যখন মৃত্যু হইল, তখন আকবর রাজধানীতে ছিলেন না, তিনি পঞ্জাবের সেকন্দরশহরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন। সেকন্দর একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কালানৌর নামক স্থানে আকবরের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। একথানা ইটের তৈয়ারী সিংহাসনে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। এসময়ে আকবরের বয়স ছিল মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর। এদিকে তখন দিল্লীর সিংহাসনের চারিদিকে ভীষণ বিপ্লব চলিতেছিল।

ভয়াবুরের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সেকন্দরশাহ নবীন উৎসাহে মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আকবর তাঁহার অভিভাবক বৈরামখাঁর সাহায্যে শত্রু-দমন করিতে লাগিলেন। এ সময়ে আর এক অশান্তির সৃষ্টি হইল। মুহম্মদ আদিলের সেনাপতি হিমু মুঘল শক্তি পর্য্যদন্ত করিবার জন্য প্রায় ত্রিশ হাজার বীর ও সাহসী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

হিমুর
পরাক্রম
পথে অতি সহজেই আগ্রা হস্তগত
হইল। আগ্রা অধিকার করিয়া
অতি দ্রুতবেগে নগর-রক্ষক-

দিগের অবহেলায় ও হঠকারিতায় হিমু নগর রক্ষী প্রহরীদিগকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করিয়া বসিলেন এবং আপনাকে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিলেন। আকবরের নিকট যখন এই সংবাদ পৌছিল, তখন অধিকাংশ প্রদেশই তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল, কেবল পঞ্চনাদের কিয়দংশ তাঁহার অধিকারে ছিল।

হিমুর এইরূপ বিজয়ে কিংকরা কণ্ঠব্য তৎসম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য আকবর তাঁহার মন্ত্রী ও ওমরাহ-বর্গকে লইয়া এক পরামর্শ সভার আহ্বান করিলেন।

সকলেই তাঁহাকে কাবুলে পলায়ন করিবার জন্ত উপদেশ দিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—“শত্রুর সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষের উপর, কিন্তু তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্ত আমাদের মাত্র বিশ হাজার সৈন্য আছে, এরূপ অবস্থায় আমাদের পক্ষে কাবুলে পলায়ন করাই কর্তব্য। আমরা এই সৈন্যের দ্বারা কাবুল রক্ষা করিতে পারিব। পরে যদি সুযোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সহজেই ভারতবর্ষ আক্রমণ করা যাইবে।”

বৈরাম অন্যান্য ওমরাহগণের এইরূপ কাপুরুষোচিত মন্তব্য গ্রহণ করিলেন না। তিনি উহার প্রতিবাদ করিলেন এবং শত্রুর সহিত যুদ্ধ করাই কর্তব্য বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। আকবর বয়সে বালক হইলেও বৈরামখাঁর এইরূপ মন্তব্য সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন। আকবর এমন সুন্দর ভাবে, এমন তেজস্বিতার সহিত তাঁহার মন্তব্য ওমরাহগণের নিকট উপস্থিত করিলেন যে ওমরাহগণও সকলে পণ করিলেন যে তাঁহারা যুদ্ধ করিবেন। বৈরামখাঁও স্বীয় পুত্রের মন্তব্যকে হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি জীবনে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। আকবর অত্যন্ত প্রাণ হইলেন এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত সমুদয় কার্য সুসম্পন্ন করিবার ভার বৈরামখাঁর উপর অর্পণ করিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে আকবর রাজা হইয়াছিলেন শুধু পঞ্জাব এবং দিল্লী লইয়া—এ-সময়ে ভারতবর্ষে রাজপুতেরা স্বাধীন ছিলেন। আরও অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল। মুঘলদিগকে একেবারে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবেন এইরূপ সংকল্প হিমুর ছিল এবং তদনুরূপ তিনি প্রস্তুতও হইয়াছিলেন।

হিমু দিল্লী-বন্দোবস্তের পর পাণিপথের বিশাল প্রান্তরে সৈন্যে সমবেত হইয়াছিলেন। যে পাণিপথের রণক্ষেত্রে ত্রিশ বৎসর পূর্বে ইব্রাহিম লোদি বাবরের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, সেখানেই তাহার সৈন্যের সহিত মুঘলের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বৈরামখাঁ খুব বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিলেন। যুদ্ধে হিমুর পরাজয় হইল এবং আকবরের জয় হইল। হিমু ভাবিয়াছিলেন যে রণনিপুণ হস্তীর দ্বারাই তিনি যুদ্ধে বিজয় লাভ করিবেন, কিন্তু শত্রু সৈন্যের মধ্য ভাগে হস্তী সমূহ লইয়া উপস্থিত হইলে শত্রুর অঙ্গাঙ্গিতে হস্তীগুলি এমন ক্ষেপিয়া উঠিল যে তাহারা রণক্ষেত্রে হইতে বিক্ষিপ্ত ভাবে মাছতের আদেশ অমান্য করিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ইহাতে হিমুর সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু হিমু নিরাশ হইলেন না, তিনি চারি

সহস্র সৈন্য লইয়া অসাধারণ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে শত্রু নিক্কিপ্ত একটা শরে তাঁহার এক চক্ষু বিদ্ধ হইল। তাঁহার পক্ষের সৈন্যেরা হিমুর নিশ্চিত মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া তাড়াতাড়ি যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। হিমু ঐরূপ আহত অবস্থায় মুঘলের হস্তে বন্দী হইলেন। বৈরামখাঁ আকবরকে বলিলেন—“হিমুর মুণ্ডটা কাটিয়া ফেল।” আকবর অসহায় বন্দীকে ঐরূপ ভাবে হত্যা করিতে অস্বীকার করিলে, বৈরাম হিমুকে নিজ হস্তে কাটিয়া ফেলিলেন। হিমুর মস্তক কাবুলে ও তাঁহার দেহ দিল্লীর দ্বারদেশে সংস্থাপিত করিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

ওদিকে পাণিপথের যুদ্ধের কিছুদিন পরেই কাবুলের বিদ্রোহের শাস্তি হইল। আকবর তাঁহার শত্রুগণকে নিহত ও পরাজিত করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল এবং সুচলকালে কিরূপ অবস্থা ছিল আমরা একজন সুলেখকের লেখনী হইতে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।—“ভারতের সিংহাসন মুঘল পাঠানের পক্ষে ছিল এক প্রকৃতির অভিশপ্ত, কেহ কখনও অবিচ্ছিন্নভাবে বংশানুক্রমে বহুদিন বহুযুগ ধরিয়া ইহার

উপর বিরাজ করিতে পারে নাই। প্রথম মুসলমান আক্রমণ হইতে বর্তমান যুগ পর্য্যন্ত এ বিষয়ের জাঙ্ঘলামান নান্দিক্রমে ইতিহাস আমাদের সম্মুখে বর্তমান। দাস বংশ গেল, খিলিজি গেল, পাঠানবংশের অস্তিত্ব লোপ হইল। শোণিতরেখা তীরে রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন নৃপতিবংশের প্রচণ্ড স্রোতগুলি যে কোথায় অস্তিত্ব হইল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আবার নূতন কুলপ্লাবী তরঙ্গ উঠিল। চাঘটাই সমরখন্দের অনুর্বির প্রাস্তুর পরিত্যাগ করিয়া রূপাণহস্তে ফরোশ-বন-রূপ-পরিপূর্ণ কুবেরের লীলাক্ষেত্র প্রকৃতির প্রমোদ-কানন হিন্দুস্থানে পদাৰ্পণ করিল। চাঘটাই মোগল বাবরশাহ পাঠানবংশের অস্তিত্ব লোপ করিয়া আবার অভিশপ্ত সিংহাসনে আসন বিছাইলেন। বাবর গেলেন, হুমায়ুন আসিলেন। আবার শেরশাহ প্রবল হইয়া উঠিলেন। আবার সিংহাসনের আন্তরগ খসিয়া পড়িল ; ভারতে মোগলের শক্তি-বিকাশের শেষটাই পর্য্যন্ত মলিন হইয়া আসিল ; সে মলিনতা সে ইহজন্মে ঘুচিবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।” [ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম সংখ্যা-১৮৯১]

আকবরশাহের সময় হইতেই মুঘল সিংহাসনের ভিত্তি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল। আকবর কিশোর

বয়সে সিংহাসনে বসিলেন। সিংহাসনে বসিবার তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি আজমীর, গোয়ালিয়র এবং জৌনপুর অধিকার করিলেন। যে শূরবংশ দিল্লী সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ করিতেছিল তাহারাও পরাজিত হইল। বৈরামখাঁ খানিখানান্ উপাধি গ্রহণ করিয়া আকবরের অভিভাবক রূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বৈরামখাঁ খুব রাগী ও অহঙ্কারী ছিলেন। পাণিপথের যুদ্ধের পর তাঁহার অহঙ্কার আরও বাড়িয়া গেল। যখন যাহা খুসী তাহাই তিনি করিতেন। আকবরকে কোন বিষয়ে একটি পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাও কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। আকবর এ সময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় লেখাপড়া না শিখিতে পারিলেও তিনি বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ছিলেন, আবার এ দিকে ঘোড়ায় চড়িতে, তাঁর নিক্ষেপ করিতে এবং তরবারি হাতে যুদ্ধ করিতেও পারিতেন অসাধারণ। তাঁহার বৈরামখাঁর অধীনতা আর ভাল লাগিতোছিল না। তিনি বৈরামখাঁকে বলিয়া পাঠাইলেন—“আমি এখন নিজস্ব রাজ্যভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনাকে যেরূপ বিশ্বস্ততা এবং সাধুতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন তাহা আমি বিশেষ ভাবেই

জ্ঞাত আছি। আপনি মক্কা যান ইহাই আমার অনুরোধ, আপনার ব্যয়-নির্বাহের জন্য আমি জায়গীর দিব।” বৈরাম প্রথমে সম্মত হইলেন, কিন্তু পরে বিদ্রোহী হইলেন। আকবর অনায়াসে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া সমুদয় দোষ ক্ষমা করিলেন এবং প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহার মক্কা যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বৈরামের কিন্তু আর যাওয়া হইল না, পথে একজন আফগানের ছুরিকাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। কথিত আছে, তাহার পিতা বৈরামের আদেশে নিহত হইয়াছিলেন। আকবর বৈরামখাঁর প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিয়া কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। •

১৫৬০-১৫৬২ খৃষ্টাব্দ—এই দুই বৎসর কাল আকবরের জীবনের কলঙ্ক স্বরূপ বলা যাইতে পারে। এসময়ে তিনি অন্তঃপুরের বিলাস প্রমোদের মধ্যে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, রাজকার্যের প্রতি মনোযোগী ছিলেন না। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ—এসময়টার ন্যায় দিয়াছিলেন [Petticoat Government—1560-1562] এবং ঐসময় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—The Young monarch, as his biographer repeatedly observes, remained behind the veil, and seemed to care for

nothing but sport. He manifested no interest in the affairs of his kingdom, which he left to be mismanaged by unscrupulous women, aided by Adam Khan Pir Muhammad and other men equally devoid of scruple.

এই দুর্বলতা আকবরের চরিত্রে বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি আপনার অবস্থা সম্যক বুঝিতে পারিলেন এবং রাজ্যশাসন সম্পর্কে ননো-যোগী হইলেন।

অতি তরুণ বয়সেই তিনি এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ, এই দেশ কেবল মাত্র মুসলমানদিগকে লইয়া চলিতে পারে না। যদি দীর্ঘকাল স্থায়ীরূপে সাম্রাজ্য শাসন করিতে হয় এবং ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তাহা হইলে উচ্চতম আদর্শে হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্য সাধন ব্যতীত তাহা কখনও সম্ভবপর হইবে না। আকবর এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া এক মহামিলনের ক্ষেত্র রচনা করিলেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সাধনের জন্ত তিনি বিশেষ ভাবে ক্রতী হইলেন। তিনি উদার ধর্ম-মত এবং ন্যায়পরায়ণতা সহকারে

রাজ্য শাসনে ত্রতী হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই
 ক্রিয়াপরায়ণ এবং সদাশয় শাসনকর্তারূপে তাঁহার সুখশ
 সুপ্রসারিত হইয়াছিল। একবার সে অনেক দিন পরে
 তাঁহার পুত্র সেলিম এক ব্যক্তির সর্ববাঙ্গ হইতে জীবদ্দশায়
 গায়ের চামড়া তুলিয়া লইবার আদেশ দিয়াছিলেন। আকবর
 সেই আদেশের বিষয় যখন জানিতে পারিলেন তখন হুঃখ
 করিয়া বলিয়াছিলেন—“মৃত পশুর চর্ম্ম তুলিবার দৃশ্যও
 আমাকে ব্যথিত করে। আমার পুত্র হইয়া সেলিম
 কিরূপে এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ প্রদান করিল!”

আকবরের সাম্রাজ্য গঠন ও রাজ্যে শৃঙ্খলা
 স্থাপন।

অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক একজন তরুণ যুবক দিল্লীর
 সিংহাসনের সর্ব্বময় কর্তা হইয়া যখন চারিদিকে আপনার
 প্রভুর বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন এই যুবকের
 বিরুদ্ধে নানাস্থান হইতে বিদ্রোহের ডঙ্কা বাজিয়া
 উঠিয়াছিল। আকবর ঐশ্বর্য্য, বিলাস, স্বচ্ছ এবং আত্ম-
 ক্ষমতা বিস্তারের জন্য শৈশব হইতেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিলেন।
 রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি দেখিলেন যে ভারতবর্ষ
 বিবিধ ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত এবং বিশৃঙ্খলতায় পূর্ণ।
 বিশৃঙ্খলতা দূর করিয়া তিনি এক সুবিশাল সুশাসিত

বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য মনোযোগী হইলেন। প্রথমে তিনি দিল্লীর নিকটে যে সকল মুসলমান রাজারা বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দমন করিয়া দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীন করিলেন। তারপর রাজপুতানার ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমতঃ আকবর খণ্ড রাজ্যসমূহ জয় করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ একচ্ছত্র করিতে সক্ষম করিলেন। তখন রাজপুত জাতি বিশেষ ক্ষমতাশালী এবং প্রতিষ্ঠাবান ছিল। আকবরের সময়ে চিতোরের* রাণা ছিলেন

রাজপুত জাতির
সহিত যুদ্ধ

উদয় সিংহ। উদয়সিংহ সংগ্রাম সিংহের পুত্র। এই সংগ্রামসিংহ বাবরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। উদয় সিংহ তাঁহার মত সাহসী ছিলেন না। আকবর যখন চিতোর আক্রমণ করিলেন, তখন উদয়সিংহ নগর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। রাজা চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু রাজপুত নরনারায়ণ পরাজয় স্বীকার করিলেন না। তাঁহার প্রাণশক্তি যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে জয়মল, তাঁহার ঘোড়শ বর্ষীয় পুত্র পুত্র, তাঁহার মাতা কশ্মদেবী, ভগিনী কর্ণবতী এবং পুত্রের পত্নী কমলাবতী

দেৱান-বাৎসল্য সন্ধান জন্ম প্রাণ দিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন।
 অপরপক্ষে আকবর নিজে এই যুদ্ধের নেতা হইয়াছিলেন।
 রাজপুত পক্ষের সেনাপতি জয়মলকে আকবর নিজ হস্তে
 গুলি মারিয়া বধ করিয়াছিলেন। জয়মলের মৃত্যুর পর
 রাজপুতগণ হতভঙ্গ হইয়া পড়িলেন, অবশেষে রাজপুত
 বীরেরা পত্নী ও দুহিতাগণের মান ও সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত
 “জহর ত্রতের” ব্যবস্থা করিয়া দিয়া একে একে যুদ্ধ করিয়া
 প্রাণত্যাগ করিলেন। এই যুদ্ধের পর আকবর
 চিতোরে প্রবেশ করিয়া ত্রিশ হাজার রাজপুতকে হীন
 বর্বরের মত হত্যা করেন,—বীরত্বের সন্মান দেখাইলেন না।
 আকবর চিতোর-জয় করিয়া অত্যাচাৰ্য্য রাজপুতদিগের সহিত
 সন্ধি করিলেন। দুই বৎসরের মধ্যেই কালিঞ্জর, বুন্দেল
 খণ্ড প্রভৃতি আকবরের অধিকারভুক্ত হইল। উদয়সিংহ
 যখন দেখিলেন চিতোর রক্ষা হইল না, তখন তিনি উদয়পুরে
 রাজধানী পরিবর্তন করিলেন।

উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাণা প্রতাপ
 সিংহ সিংহাসনে বসিলেন। প্রতাপ আকবরের অধীনতা
 মানিলেন না। প্রতাপের ন্যায় স্বদেশবৎসল তেজস্বী
 মহাপুরুষ পৃথিবীর ইতিহাসে অতি অল্প দেখা যায়।
 আকবর প্রতাপকে পরাজিত করিবার জন্য তাঁহার প্রধান

সেনাপতি অম্বরের রাজা মানসিংহ ও মহবৎখাঁকে

রাণা প্রতাপ বহুসৈন্য সহ প্রেরণ করিলেন।

ও হলদিঘাটের যুদ্ধ হলদিঘাট নামক পার্শ্বত্যা পথে

দুইপক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে রাণাপ্রতাপ ও রাজপুত সৈন্যেরা অসাধারণ সাহস ও বীরত্ব দেখাইলেন। কিন্তু কোনরূপেই যুদ্ধ জয়ী হইতে পারিলেন না। চৌদ্দ হাজার রাজপুত দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে প্রতাপের জীবনও বিপন্ন হইয়াছিল। শুধু তাহার এক প্রভুভক্ত সর্দারের আত্মত্যাগে প্রতাপের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। প্রতাপ বেখানে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাহার দুই পাশে তাহার রাজচক্র ও পতাকা ছিল; মুঘল সৈন্যেরা সেই দিকে লক্ষ্য করিয়াই গোলাগুলি নিক্ষেপ করিতেছিল। মায়া নামে এক সর্দার প্রতাপের জীবন রক্ষার জন্য প্রতাপকে সেখান হইতে সরাইয়া দিয়াছিল। সেই চক্রতলে দাঁড়াইলেন। মুঘলেরা প্রতাপ মর্মে করিয়া তাহাকেই বধ করিল। প্রতাপ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন এবং বনে ও পর্বতে আশ্রয় লইয়া অনিদ্রায় অনাহারে নানা ক্লেশ সহ করিয়া কোনরূপে আপনার প্রাণরক্ষা করিতে লাগিলেন।



রাজী বিপুল বিক্রমে শত্রু-সৈন্যের গতি প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন।

যুগ্ম ভারত, পৃঃ ৬০

এইরূপে নানা ক্রেশ সহ করিয়াও প্রতাপ আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। অবশেষে ভামসা নামক একজন মন্ত্রী অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং চিতোর ভিন্ন তাঁহার সমস্ত রাজ্য মুসলমানদের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন। চিতোর উদ্ধার করিতে পারিলেন না বলিয়া, তিনি মনের কষ্টে তৃণ-শয্যা ব্যতীত অন্য শয্যায় শয়ন করিতেন না, বৃক্ষ-পত্র ভিন্ন অন্য পাত্রে আহার করিতেন না।

রাণী দুর্গাবতী

এখানে একজন বীরাস্ত্রনার কথা বলিব। তৎকালে রাণী দুর্গাবতী 'গড়মণ্ডলের শাসনকত্রী' ছিলেন। নন্দাদাতীরবতী 'গড়মণ্ডলের রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য আকবর সেনাপতি আসফখাঁকে প্রেরণ করিলেন। দুর্গাবতী তেজস্বিনী বীরনারী ছিলেন। আসফখাঁ গড়মণ্ডল রাজ্য আক্রমণ করিলে, রাণী বিপুলবিক্রমে শত্রু সৈন্যের গতি প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে সৈন্যেরা এই বীরমহিলার অসাধারণ বীর্যবতার কাছে বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। এমন সময়ে দৈবক্রমে শত্রুর নিকৃষ্ট তীরে দুর্গাবতীর এক চক্ষু বিদ্ধ হইল। তিনি যখন দেখিলেন যে

দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা অসম্ভব তখন আত্মহত্যা করিলেন, তথাপি শত্রুহস্তে বন্দি নী হইলেন না। আসফখাঁ দুর্গাবতীর মৃত্যুতে অতি সহজেই গড়মগুল হস্তগত করিলেন। কথিত আছে তিনি পূর্ণ একশত কলস স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। আসফখাঁ এই ধনরাশির অধিকাংশ আত্মস্থান্য করিয়াছিলেন; ইহার ফলে আকবরের সহিত আসফখাঁর কলহের সৃষ্টি হইয়াছিল।

চাঁদ মুলতানা

চাঁদমুলতানা নামে আর একজন তেজস্বিনী মহিলার সহিতও আকবর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। চাঁদমুলতানা ছিলেন আমেদনগরের নাবালক মুলতানের অভিভাবিকা। আমেদনগর জয় করিবার জন্য আকবরের পুত্র মুরাদ তাহার প্রধান সেনাপতি খানখানানের অধীনে ত্রিশ হাজার সৈন্যদ্বারা আমেদনগর অবরোধ করেন। চাঁদমুলতানা যেরূপে আমেদনগরের দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা মুসলমান ঐতিহাসিকেরা হুলস্থল অক্ষরে স্বর্ণী করিয়া গিয়াছেন। মুঘল সৈন্যের দ্বারা আমেদনগর দুর্গের একদিককার প্রাচীরের কিয়দংশ ভগ্ন হইলেও দুর্গের ভিতরের বড় বড় সেনাপতিরা পলায়ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

এমন সময় বর্ষপরিহিতা চাঁদবিবি তরবারি হস্তে প্রাচীর
মুখে দাঁড়াইয়া নিজে অপূর্ব বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন।
এইরূপ প্রবাদ আছে যে গোলাগুলি ফুরাইয়া গেলে
চাঁদবিবি তাঁহার বন্দুক ও কামানে তামা, রূপা ও সোণার
মোহর পুরিয়া নিক্ষেপ করেন। পরিশেষে মণি-রত্নাদি
নিক্ষেপ করিবার সময় আসিলে তবে সন্ধি স্থাপন করেন।
চাঁদবিবির অভূতপূর্ব তেজস্বিতা ও সাহসে মুগ্ধ হইয়া মুরাদ
তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন।

চিতোর জয়ের পর আকবর গুজরাট জয় করেন। হুমায়ুন

গুজরাট-বিজয়

একবার সাময়িক ভাবে গুজরাট

জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি

শেরশাহকে দমন করিতে পূর্বদিকে অগ্রসর হইলে ঐ সুযোগ
গ্রহণ করিয়া গুজরাট পুনরায় স্বাধীন হইয়াছিল।
আকবর ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট আক্রমণ করেন। তিনি
একবসন্তের পর ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সমুদয় গুজরাট প্রদেশ
অধিকার করেন। গুজরাট বিজিত হইলে পর মুঘল-
রাজ্য পশ্চিম দিকে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল।

বাঙ্গালাদেশে অভিযান।

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বঙ্গ-বিজয় করেন। এই সময়ে দাউদ খাঁ বাঙ্গালার রাজত্ব করিতেছিলেন। দাউদ খাঁ বাঙ্গালার সুলেমান কররাণীর পুত্র। সুলেমান কররাণী আত্যন্ত সাহসী এবং পরাক্রমশালী সুলতান ছিলেন। তিনি উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। সে সময়ে উড়িষ্যা বিশেষ ক্ষমতাশালী রাজ্য ছিল। উড়িষ্যার রাজারাও খুব সাহসী ছিলেন। তাঁহারা বহুবার বাঙ্গালাদেশ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। সুলেমানের কালাপাহাড় নামে একজন সাহসী সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার সাহায্যেই তিনি উড়িষ্যা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুলেমান কররাণী আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া বেশ শান্তি-সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু দাউদ আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দের বর্ষা ঋতুতে আকবর স্বয়ং বাঙ্গালাদেশে অভিযান করিয়া পাটনা অধিকার করিলেন। দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। আকবরের সেনাপতি মুনিমখাঁ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দাউদকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। দাউদ আবার বিজোহী হইলেন। কিন্তু এইবার রাজমহলের নিকট সম্পূর্ণরূপে

পরাজিত এবং নিহত হইলেন [১৫৭৬ খ্রীঃ] । বাঙ্গলাদেশ
হইতে স্বাধীন পাঠান রাজ্য বিলুপ্ত হইল ।

রাজ্য বিস্তার

আকবর এই ভাবে একে একে কাশ্মীর, সিন্ধুদেশ,
উড়িষ্যা, বেলুচিস্তান এবং কান্দাহার প্রভৃতি জয় করেন ।
এইরূপে উত্তর ভারত এবং কাবুল, কান্দাহার, গজ্জনী
প্রভৃতি লইয়া তাঁহার এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপিত
হইল । দাক্ষিণাত্যের আমেদনগর ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে
তাঁহার অধিকারে আসিল । কিন্তু এ সময় তিনি
আমেদনগরের উত্তরাংশ মাত্র অধিকার করিতে সমর্থ
হইয়াছিলেন । চন্দ্রমূলতানা, আমেদনগরবাসীর ষড়যন্ত্রে
হত হওয়ায় আমেদনগর অধিকার করিবার পক্ষে তাঁহার
বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছিল । আমেদনগরের বাকী অংশ
অনেক দিন পরে আকবরের পৌত্র শাহজাহানের সময়
মুঘল সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল ।

আকবরের রাষ্ট্রনীতি

আকবর মাহঙ্গী ও বিজয়ী বীর ছিলেন বলিয়াই যে আজও
তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া আছে তাহা নহে,
তিনি রাজ্যে শান্তিস্থাপন এবং হিন্দু মুসলমানের

মিলনের জন্য যে চেষ্টা ও যত্ন করিয়া গিয়াছেন সেই জন্যই তাঁহার এত প্রশংসা। আকবর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাহাতে বিবাহ হয় সে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুঘল সম্রাটগণের মধ্যে সর্ব প্রথমে আকবরই হিন্দু রমনীদিগকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথমা হিন্দুপত্নী হইয়াছিলেন জয়পুরাধিপতি বিহারীমলের কন্যা, আর এক হিন্দুপত্নী ছিলেন, যোধপুরাধিপতির কন্যা। যোধপুরী বেগমের পুত্রের নাম জাহাঙ্গীর। জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম বা জাহাঙ্গীরের সহিত তিনি দুইটি রাজপুত কুমারীর বিবাহ দিয়াছিলেন। আকবর এইরূপ কুটুম্বিতাসূত্রে এবং উদার আচরণে অনেক রাজপুত নৃপতিকে বশীভূত করিয়াছিলেন। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলকেই তিনি যোগ্যতা অনুযায়ী উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করিতেন। সে সময়ে মুসলমান ভিন্ন প্রত্যেক জাতিরই জিজিয়া নামে একটা কর দিতে হইত। হিন্দুদের প্রাণে ইহাতে বড়ই আঘাত লাগিত। আকবর জিজিয়া কর তুলিয়া দিয়াছিলেন। আকবর জমীনার অসাধারণ শক্তিতে ও সৌহার্দ্য সূত্রে ভারতবর্ষের বহু রাজ্য জয় করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

শাসনকার্য্য সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ শৃঙ্খলাবধান



সত্যি সত্যি



www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

করিয়াছিলেন। আকবর শাসন কার্যের সুবিধার জন্য তাঁহার অধিকৃত সাম্রাজ্য পনেরটি সুবায় বিভক্ত করেন, যথা—কাবুল, লাহোর—কাশ্মীরও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল, মুলতান—সিন্ধুপ্রদেশ সহ—দিল্লী, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আজমীর, আহম্মদাবাদ গুজরাট, মালব, বিহার, বাঙ্গালা (উড়িষ্যাসহ), খান্দেশ, বেরার এবং আহম্মদনগর। সুবা ভাগ করিয়া আবার বহু সরকার এবং সরকার ভাগ করিয়া অনেক পরগণা করিয়াছিলেন। সুবাদারগণ তাঁহাদের সুবায় সম্রাটের ন্যায় দরবার করিতেন এবং স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ সুবা শাসন করিতেন। সুবাদারের অধীনে রাজস্ব আদায়ের জন্য এক এক জন কর্মচারী নিযুক্ত রহিতেন। তাঁহারা ‘আমলতাজার’ নামে অভিহিত হইতেন। বিচারের জন্য কাজী নিযুক্ত থাকিতেন। প্রজারা যাহাতে নির্দিষ্ট হারে নিয়মানুযায়ী কর দিতে পারে সেজন্য তিনি মহারাজা টোডর মল্লকে দিয়া রাজ্যের সমস্ত জমির পরিমাপ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে আকবর শেরশাহের রাজস্ব নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। ভূমিতে যাহা উৎপন্ন হইত, তাহার এক তৃতীয়াংশ রাজকর ধার্য হইত। প্রজারা ইচ্ছা করিলে অর্থ বা উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা রাজকর দিতে পারিত।

আকবর গুণী ব্যক্তির অত্যন্ত আদর করিতেন। তাঁহার যে সকল মন্ত্রী বা হিতৈষী বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রভুভক্ত, জ্ঞানী, এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। রাজা টোডর মল্ল জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি হিসাবাদি কার্যে অতি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। সম্রাটের আদেশে ইনি জরিপ ও রাজস্বের সুনিয়ম করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে যখন পাঠানেরা বিদ্রোহী হয়, তখন টোডর মল্ল বাংলাদেশে বাইরা সিংহী সিংহী দমন করেন। ফৈজী ও আবুল ফজল নামে দুই ভাই ছিলেন। আকবর এই দুই ভাইকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ফৈজী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের কোন কোন অংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। আবুল ফজল আকবর নামা ও আইনি আকবরী নামে আকবরের সময়ের প্রসিদ্ধ ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। বীরবল আকবরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কৃত্রিমিক ছিলেন। তাঁহার কথায় লোক না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। আকবর ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আফগানিস্থানে যুদ্ধ করিতে বাইরা সিংহী তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজা খানসিংহ আকবরের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইনি আকবরকে নানা যুদ্ধে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন।

মানসিংহ অনেক প্রদেশের সুবাদারের কার্য করিয়া আপনার দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তানসেন—এমন সুবিখ্যাত গায়ক ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন।

ধর্মসম্বন্ধে মতামত

ধর্মসম্বন্ধে আকবর অত্যন্ত উদার ছিলেন। কোন ধর্মের প্রতিই তিনি বিদ্বেষ করিতেন না। আকবর এক উদার ও বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজসভা সকল সম্প্রদায়ের, সকল মতাবলম্বীর এবং সকল জাতির লোকের কেন্দ্রস্থান ছিল। নানা দেশের সমাজ, জাতি ও ইতিহাসের বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে আকবর অত্যন্ত ভালবাসিতেন। প্রতি শুক্রবারে বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদিগকে একত্রিত করিয়া তিনি তাহাদের ধর্মসম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক শুনিতে ভালবাসিতেন। আকবর নিজে এক ধর্মমতের প্রবর্তন করেন। তাঁহার ধর্মমতের নাম—হোমি-ই-ইলাহি। এই ধর্মের মূলসূত্র নিম্নোক্ত কবিতাতেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

“The Lord To me the kingdom gave

He made me wise, and strong, and brave,

He girdeth me in right and truth,
 Filling my mind with love of truth,
 No praise man can sum his state,
 Allahu Akbar ! God is Great,"

আকবরের রাজনীতি অতি ন্যায্যনুমোদিত ছিল। আমরা এখানে আকবরের নিজের উক্তি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। “অসত্যাচরণ সকলের পক্ষে গর্হিত, বিশেষতঃ রাজার পক্ষে অতিশয় গর্হিত। এই সকল লোককে ঈশ্বরের ছায়া বলে, ছায়া সরল থাকিবে। চারিটি কার্য হইতে রাজা নিবৃত্ত থাকিবেন,— মৃগয়া, নিরন্তর ক্রীড়ামোদ, দিবারজনী মত্ততা, স্ত্রীলোকের সঙ্গে সমধিক ঘনিষ্ঠতা।”

সমাজ-সংস্কার

আকবরের দৃষ্টি সর্বদিকে সমান ভাবে নিবিক্ষিত ছিল। ভারতবর্ষের সামাজিক সংস্কারের দিকেও তিনি মনোযোগী ছিলেন। নিম্নলিখিত সমাজ-সংস্কার কার্যে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন—[১] সহমরণ নিষারণ, [২] ঘনিষ্ঠ স্বর্ণণের পরিবর্তে দূরতর সম্পর্কে বিবাহ দিবার প্রথা প্রবর্তিত করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন। [৩] বিধবা

বিবাহ প্রচলনের জন্যও তিনি বিধি প্রচার করেন, বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন, বিবাহ বিধির বিরুদ্ধেও মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং ধর্মের নামে পশু হত্যা করে যে গুরুতর অন্যায় তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি এই সকল সামাজিক সংস্কারের জন্য কোনরূপ কঠোর বিধি প্রবর্তন করেন নাই, দৃষ্টান্ত ও যুক্তির দ্বারা প্রজাসাধারণকে ঐরূপ সংস্কার কার্যে ত্রুতী করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আকবর সাহিত্য, ধর্ম এবং সমাজ সম্বন্ধে বিবিধ সংস্কার করিয়া যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তেমনি রাজস্ব সম্পর্কিত বিবিধ সংস্কার দ্বারা ভারতবর্ষের এক অসাধারণ কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন।

রাজস্বনীতি ও সামরিক নীতি

তিনি প্রথমতঃ সমস্ত ভূমিই পরিমাপ করিয়া প্রত্যেক বিধায়ক পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা নির্ধারণ করেন। এক্ষণে তিনি সর্বস্থানের জমি একজাতীয় নলের সৃষ্টি করেন। এবং উর্বরতা অনুসারে ভূমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

আকবরের সামরিক বিধি ব্যবস্থাও নূতন ভাব
সম্বলিত হইয়াছিল। প্রত্যেক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরা
এক একজন সৈন্যাধ্যক্ষ থাকিতেন। এমন কি সিপাহী-
শালার—সুবাদার, নবাব প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া

সামরিক নীতি বাবুর্চিখানার প্রধান কর্মচারী পর্যন্ত
সকলেই সৈনিক কর্মচারী ছিলেন

কেহ চারি হাজারের, কেহ দশহাজারের মনসবদার হইতেন
এই সকল মনসবদারদের এবং উচ্চপদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষদের
বেতন পঁচাত্তর টাকা হইতে ত্রিশহাজার টাকা পর্যন্ত ছিল।

১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে আকবর খান্দেশ বিজয় করেন।

খান্দেশ বিজয় এই যুদ্ধে আবুল ফজল অসাধারণ
বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

দুর্ভেদ্য আশীরগড় দুর্গ অধিকার করিয়া আবুল ফজল বিশেষ
যশো লাভ করেন। এই বৎসরই আবুল ফজল সম্রাটের
আদেশে দক্ষিণাপথ হইতে রাজধানীতে ফিরিবার সময় রাজ-
কুমার সেলিমের ষড়যন্ত্রে নিহত হইয়াছিলেন। আকবর
প্রিয়তম বন্ধুর মৃত্যুতে এতদূর শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন যে
দুই তিন দিন পর্যন্ত তিনি অন্নভক্ষণও গ্রহণ করেন নাই।

খান্দেশ জয়ের চারি বৎসর পরে সাহজাদা দানিয়ালের
মৃত্যু হয়। সম্রাট দানিয়ালকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

এই নিদারুণ শোকে অর্জুনিভ হইয়া তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। সে সময়ের ভিষকশ্রেষ্ঠ হাকিমআলী এবং বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রের সুবিজ্ঞ ভিষকগণ বাদসাহের পীড়া আরোগ্য হওয়া অসম্ভব মনে করিলেন। ~~কিন্তু~~কিন্তুই বুঝিতে পারিলেন যে বাদসাহের জীবন-দীপ নির্বাপিত হইবার আর বেশী বিলম্ব নাই।

কিছুদিন পূর্বে আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। বাদসাহ যখন পীড়িত ছিলেন, তখন সমুদয় রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেন সচিব-শ্রেষ্ঠ খান-ই-আদম। রাজা মানসিংহ আকবর শাহের একজন প্রধান সৈন্যধ্যক্ষ। তিনি মুঘল দরবারে বিশেষ ক্ষমতাসালী ব্যক্তি ছিলেন। সেলিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরু, মানসিংহের ভাগিনেয় এবং খান-ই-আদমের জামাত। তাঁহারা খুসরুকে রাজসিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আকবর মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও এ সংবাদ শুনিতে পাইয়া তাহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত ওমরাহগণকে তাঁহার শয়ন কক্ষে আসিবার জন্য সেলিমকে ইঙ্গিত করিলেন। সেলিম ওমরাহগণকে লইয়া শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলে পর সকলের নিকট

কোষবিচ্যুতির জম্ম জন্মা চাহিলেন। সেলিম বাদসাহের পক্ষপালে পাড়িয়া অশ্রুবিষর্জন করিতে লাগিলেন। বাদসাহ ইচ্ছিত করিয়া সেলিমকে তাঁহার তরবারি গ্রহণ করিতে বলিলেন। তৎপর সম্রাটের আদেশে সেলিম রাজাস্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে এবং তাঁহার পুরাতন বন্ধুবান্ধবগণের প্রতি উদার সম্মানজনক ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে আকবর সেলিমকে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া চিরদিনের জম্ম পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঐতিহাসিক ম্যালিসন্ সাহেব আকবর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“জাতির কল্যাণের জন্য বিধাতা যে সকল মহাপুরুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া কোটি কোটি নর-নারীর সুখ ও শান্তির বিধান করিয়া থাকেন আকবরও সেইরূপ একজন ঐশ্বর প্রেরিত মহামনীষী ব্যক্তি ছিলেন—একথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।”

আগ্রার কিছুদূরে ফতেপুর সিক্রী নামক স্থানে আকবর এক নূতন সহর নির্মাণ করিয়াছিলেন। অনেক সময় আকবর সেখানে থাকিতেন। আজও সেখানকার লালপাথরের গড়া সুন্দর সুন্দর বাড়ী গুলি তাঁহার কীর্তি প্রচার করিতেছে। আকবর পঞ্চাশ বৎসর

কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হইয়াছিল।

আকবর দেখিতে মধ্যমাকৃতি ছিলেন, উচ্চতায় পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চির বেশী ছিলেন না কিন্তু তাঁহার দেহ সুসংগঠিত এবং বেশ শক্তিশালী ছিল। তাঁহার গায়ের রং খুব ফর্সা ছিল না। তাঁহার কণ্ঠস্বর উচ্চ ছিল। প্রত্যেকটি ব্যবহারে—সব বিষয় তাঁহার রাজোচিত গুণ ফুটিয়া বাহির হইত। একদিকে যেমন তিনি দয়ালু হৃদয় ছিলেন, তেমনি সময় সময় অত্যন্ত কঠোর হইতেও জানিতেন। ন্যায়বিচার তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। তিনি লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু জ্ঞানলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার খুব বেশি, শিল্প ও স্থাপত্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কতেপুর সিক্রী তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সৌকেন্দ্রায় তাঁহার সমাধি-মন্দির মুঘল স্থাপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শন।

আকবরের শাসন কালে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার সুযোগ পান করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ নরপতি ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতের বিবিধ কল্যাণ হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীর

আকবরের মৃত্যুর পর ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেলিম জাহাঙ্গীর বা পৃথিবী-জয়ী এই উপাধি গ্রহণ করিয়া ভারতের সম্রাট হইলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সর্বপ্রধান ঘটনা খসরুর বিদ্রোহাচরণ। জাহাঙ্গীর স্বীয় আত্মচরিতে এই বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। উহা হইতে জানিতে পারা যায় যে খসরুকে দমন করিবার জন্য তাঁহাকে ক্রীকপ নিষ্ঠুরাচরণ করিতে হইয়াছিল। হাসান বেগ ও আবদুল রহিম নামক দুইজন ওমরাহ খসরুর একান্ত অনুরাগী ও প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন। জাহাঙ্গীর

খসরুর বিদ্রোহ
ও পরিণাম

তাঁহাদিগকে বুকের চর্মের মধ্যে ও
গর্দভের চর্ম-মধ্যে পুরিয়া গর্দভ-
পৃষ্ঠে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলেন।

হাসানবেগ এই অবস্থায় নিঃশ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন কিন্তু আবদুল রহিম বন্ধুগণের সাহায্যে মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। ইহার পর রাজপথের উভয় পার্শ্বে ত্রিশূল সকল প্রোথিত করিয়া খসরুর তিনশত অনুচরকে তদুপরি নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। খসরুকে প্রত্যহ বধ্যভূমিতে আনিয়া এই শোচনীয় দৃশ্য দেখান



১৮৮২

১৮৮২, ৭/৮

The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

হইত। কিছুদিন পরে জাহাঙ্গীর শিক্‌সহের বশবর্তী হইয়া পুত্রকে আংশিক স্বাধীনতা প্রদান করেন। কিন্তু পুনরায় ঋক্ষ বিরুদ্ধাচরণ করায় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিবার আদেশ প্রদান করেন। সম্রাটের আদেশ প্রতিপালিত হইলে পর জাহাঙ্গীর ঋক্ষের মন্ত্রণা ও অশুভাপ দর্শনে ব্যথিত হইয়া তাঁহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। চিকিৎসার গুণে রাজকুমার কিঞ্চিৎ দৃষ্টিশক্তি লাভ করায় জাহাঙ্গীর প্রীত হইয়া চক্ষু চিকিৎসককে পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বিতীয় প্রধান ঘটনা—বর্দ্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানের হস্তে বাঙ্গালার সুবাদার কুতবউদ্দীন ও কুতবউদ্দীনের অশুচরণের হস্তে শের আফগানের মৃত্যু। এ বিষয়ের সহিত একটি সুন্দর প্রণয় কাহিনী যুক্ত রহিয়াছে। জাহাঙ্গীর শের আফগানের পত্নী মেহেরুন্নেসাকে ভালবাসিতেন কাজেই শের আফগান বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর বর্দ্ধশাহ তাঁহার পত্নী মেহেরুন্নেসাকে বিবাহ করিবেন। এই ঘটনার ইতিহাস এইরূপ। মেহেরুন্নেসা পারস্য দেশের এক বণিকের কন্যা, ইহার পূর্ব নাম ছিল মেহেরউমিসা। ইহার পিতা দারিদ্র্য হুঃখ নিবারণের জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীর যৌবনকালে অমৃতপুরের মধ্যে এই পরমাত্মন্দরী বালিকাকে দেখিতে পাইয়া ভালবাসিয়াছিলেন। সেলিম মেহেরউল্লিসার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহেন; কিন্তু শেরআফ্‌গান্ নামক একজন যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহের কথাবার্ত্তা পূর্বেই স্থির হওয়ায় শেরআফ্‌গানের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর সত্ৰাট্ হইয়া কৌশল করিয়া শেরআফ্‌গান্কে বধ করিয়া মেহেরউল্লিসাকে আগ্রায় আনিয়া বিবাহ করেন। ১৬১১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই বিবাহ হয়। শেরআফ্‌গানের হত্যাব্যাপারে জাহাঙ্গীর দোষী ছিলেন কি নির্দোষী ছিলেন ইহা লইয়া অনেক বিতর্ক আছে।

বিবাহের অল্প দিন পরেই মেহেরউল্লিসা জাহাঙ্গীরের প্রধান ও প্রিয়তমা মহিষী হইয়া উঠিল। তিনি প্রথমতঃ নূরজাহান [The light of the palace] এবং তাহার পর তল্পদিনের মধ্যেই [The queen, the light of the world] অগতির আলো উপাধি ভূষণে ভূষিত হন। নূরজাহানের যেমন ছিল সৌন্দর্য্য, তেমন ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। কিছুকালের মধ্যেই তিনি জাহাঙ্গীরের উপর অসাধারণ ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। নূরজাহান রাজকীয় সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিতেন, সর্ব্ববিধ সম্মান বিতরণের ভার

তাহার উপরই মস্ত ছিল। তিনি স্বাধীন নৃপতির ন্যায় ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহার নিজ নামে খেতবা পাঠ হইত না। তাঁহার নাম-সংযুক্ত রাজমুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল। সনন্দের রাজকীয় মোহরও তাঁহার দ্বারা স্বাক্ষরিত হইত। বাদশাহ নূরজাহানের হাতের পুতুল হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—রাজকার্য্য পরিচালনায় নূরজাহানই যোগ্য ব্যক্তি। কেবল এক বোতল মদ এক এক টুকরা মাংসই আমার নিজের সম্ভাব বিধানের পক্ষে যথেষ্ট।” নূরজাহান অশেষ গুণশালিনী ছিলেন বলিয়া সকলের প্রিয় হইতে পারিা ছিলেন। তিনি দাম্ভীলা এবং পরোপকারী ছিলেন। অনেক নিকৃপায়া বালিকা তাঁহার অর্থ সাহায্যে বিবাহিতা হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীর পিতার প্রবর্তিত রাজনীতি অনুসারে রাজ্য-শাসন করিতেন। এসময়ে যে সকল রাজকর্ম্মচারী নিজ নিজ ক্ষমতার দ্বারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গিয়াস বেগ, আসফখাঁ প্রভৃতি প্রধান। গিয়াসবেগ নূরজাহানের পিতা, নূরজাহানের সাহায্যে তিনি উজ্জরী পদ লাভ করিয়াছিলেন। আসফখাঁ নূরজাহানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইহার উন্নতির মূলেও নূরজাহানের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। আসফখাঁ রাজনীতিজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্যক্তি

ছিলেন। মহবত খাঁ ছিলেন একজন প্রধান সেনাপতি। ইনি জাজিতে দাঠান ছিলেন। মহবত খাঁ বাদশাহের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজকুমার খুরম বাদশাহের তৃতীয় পুত্র, বীর ও তেজস্বী বলিয়া সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বে ইয়োরোপীয় বণিকগণ প্রথমে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা এগার মাস কাল সমুদ্র-পথে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে কালিকাট নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। অতঃপর ইংরেজ, ফরাসি আরও অনেক জাতি আসিয়া ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তান উইলিয়াম হকিন্স হেক্টার নামক জাহাজে চড়িয়া সুরাট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ের সর্ব সন্ধক্ষে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত সুবিধাজনক সর্বের ব্যবস্থার জন্যই তিনি আসিয়াছিলেন। হকিন্স একজন তুর্কি দ্বিভাষীর সাহায্যে সম্রাটের সহিত কথাবার্তা বলিয়াছিলেন। এবং জাহাঙ্গীরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি মুঘল দরবারের একটা ইতিহাসও লিখিয়া গিয়াছেন। জাহাঙ্গীর হকিন্সের সমুদয় প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। তিনি হকিন্সকে

রাখিবার চেষ্টা করিতেন। কান্দাহার—মুঘলদের হস্তচ্যুত হইলে, পারস্যশাসিত্রির হস্ত হইতে কান্দাহার উদ্ধার করিবার জন্য নূরজাহান চক্রান্ত ও কৌশল করিয়া শাহজাহানকে উদ্ভবদেশে পাঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শাহজাহান এই চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া সম্রাটের আদেশ পালন করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহার ফল এই হইল যে নূরজাহান স্বয়ংগ পাইয়া পিতা-পুত্রের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিয়া দিলেন। জাহাঙ্গীর শাহজাহানের সমস্ত জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিলেন।

শাহজাহান এই অপমান ভাল ভাবে গ্রহণ করিলেন না, তিনি বিদ্রোহ করিলেন এবং সসৈন্যে দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বাদশাহী ফৌজের সহিত শাহজাহানের যুদ্ধ হইল। শাহজাহান পরাজিত হইলেন এবং দক্ষিণাত্যের দিকে পলায়ন করিলেন। বাদশাহের অপর পুত্র পরভেজ এবং সেনাপতি মহাবৎখা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। দক্ষিণাত্যের কোনও রাজা শাহজাহানকে সাহায্য করিলেন না, নিকৃপায় হইয়া শাহজাহান বঙ্গদেশে প্রস্থান করিলেন। সে সময়ে আব্রাহিম ফতে খাঁ নামে নূরজাহানের এক ভ্রাতা বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি শাহজাহানকে আক্রমণ করিলেন

কিন্তু শাহজাহানের নিকট পরাজিত হইলেন। ফতেখাঁরও যুদ্ধে মৃত্যু হইল। অতঃপর শাহজাহান বিহারের দিকে যাত্রা করিলেন। বিহারের শাসনকর্ত্তা শাহজাহানের ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করায় বিহার অতি সহজেই শাহজাহানের হস্তগত হইল। শাহজাহান বিহারের শাসন-ব্যবস্থা করিয়া দিল্লীর দিকে রওনা হইলেন। এলাহাবাদের নিকট জসি নামক স্থানে রাজকুমার পরভেজ এবং সেনাপতি মহবৎখাঁর সহিত শাহজাহানের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে শাহজাহান সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন এবং নিরুপায় হইয়া পুনরায় দাক্ষিণাত্যের দিকে গমন করিলেন। সেখানে মুঘলের পরম শত্রু মালিক আশ্বেরের সহিত—শাহজাহান যোগদান করিলেন। বাদশাহ পুত্র শাহজাহানের পরাজয় সংবাদ জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলেন এবং মহবৎখাঁকে বঙ্গদেশের স্যুবদারী পদে নিযুক্ত করিলেন ও তাহার প্রতি এই আদেশ প্রেরণ করিলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত শাহজাহান সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত না হইবেন ততদিন যেন মহবৎখাঁ শাহজাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নিরস্ত না হন এবং সেই সময়ে প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা বাংলা দেশ শাসন করিবেন।

বাদশাহ মহবৎখাঁর প্রতি যে অনুগ্রহ দেখাইতেছিলেন কিছুকাল পরেই তাহার পরিবর্তন হইল। ইহার কারণ যে নূরজাহান, সে কথা না বলিলেও চলে। পূর্বেই বলিয়াছি জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর যাহাতে তাঁহার কন্যার জামাতা বাদশাহের অন্যতম পুত্র শাহরিয়ার সিংহাসন লাভ করেন তাহাই ছিল নূরজাহানের ইচ্ছা। নূরজাহানের এই মতের মহবৎখাঁ ছিলেন প্রধান বিরোধী, কাজেই নূরজাহান ও তাঁহার ভ্রাতা উভয়েই মহবৎখাঁকে সম্রাটের চক্ষে হীন করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন। তাঁহারা মহবৎখাঁকে রাজদ্রোহী এবং রাজস্ব অপহরণকারী বলিয়া সম্রাটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। মহবৎখাঁর সহিত শাহজাহানের যখন যুদ্ধ হয় তখন বহু হস্তী তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, মহবৎখাঁ তাহা বাদশাহের নিকট গথাসময়ে প্রেরণ করেন নাই। জাহাঙ্গীর অভিযোগের বিবরণ বিশ্বাস করিলেন এবং মহবৎখাঁকে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। এই সময়ে বাদশাহ কাবুলে গাইতেছিলেন। কিলাম নদীর তীরে তাঁহার শিবির সংস্থাপিত ছিল। মহবৎখাঁ সম্রাটের সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রে দেখা করিতে পারিলেন না। তখন

তিনি বাদশাহকে বলপূর্বক হস্তগত করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন কাবুলের পথে খিলায় নদী পার হইতেছিলেন তখন মহবৎ অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে সম্রাটকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়া ফেলিলেন। বাদশাহকে বন্দী করিলেও তাঁহার সম্মান এবং মর্যাদা এবং আরামপ্রিয়তার দিক দিয়া কোনওরূপ ত্রুটি বাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার বিলাস ও আরামের কোনও ত্রুটি হইতেছেন দেখিয়া সন্তুষ্টই ছিলেন। নূরজাহান স্বামীর মুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়া যখন ব্যর্থ হইলেন তখন নিজেও বাদশাহের সহিত বন্দিদা হইলেন। এই সময়ে মহবৎখাঁ সম্পূর্ণরূপে জাহাঙ্গীরকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এমন কি তিনি মহবৎখাঁর অভিযোগ অনুযায়ী বেগমের প্রাণদণ্ডের জন্য আদেশ পত্র স্বাক্ষর করিলেন। কথাটা যখন নূরজাহান শুনিলেন তখন তিনি বলিলেন, “একবার আমাকে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাত করিতে দাও এবং তিনি যে ইচ্ছা আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ পত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন সেই হস্ত অগ্রসিক্ত করিতে দাও।” মহবৎখাঁর সাক্ষাতে নূরজাহান বাদশাহের

নিকট আনীত। হইলেন। মানসিক যন্ত্রণায় নূরজাহানের সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধিত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর মুগ্ধ হইলেন, তিনি করুণ কণ্ঠে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিলেন, “মহবৎ, তুমি কি এই নারীর জীবনরক্ষা করিবে না? দেখ, নূরজাহান কিরূপ অশ্রু-বিসর্জন করিতেছে!” মহবৎ বলিলেন, “আপনার আদেশ অপূর্ণ রহিবেনা। নূরজাহান প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবেন।” ইহার পর নূরজাহান অতি সুন্দর কৌশলের সহিত নিজেও মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটেরও মুক্তি সাধন করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর মহবৎখাঁর এই দুর্ব্যবহার ক্ষমা করিয়াছিলেন এবং বিদ্রোহী শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে নানারূপ গোলযোগ আরম্ভ করায় তাঁহার দমনের জন্য মহবৎখাঁকে তথায় পাঠাইয়াছিলেন। মহবৎখাঁ দাক্ষিণাত্যে পৌঁছবার পূর্বে পরভেজ অতিরিক্ত মত্তপান করিয়া পরলোকগমন করিলেন। এদিকে শাহজাহানও পিতার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। মহবৎখাঁ ও শাহজাহানের মিলনের পর সম্রাট অতি ক্ষয়দিনই বাঁচিয়াছিলেন। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার খাস কাশের পীড়া প্রবল আকার ধারণ করিল। এই সময়ে জাহাঙ্গীর কান্দহারে বাইতে-

ছিলেন। একদিন পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, সঙ্গীয় বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিয়াও রোগের উপশম করিতে পারিলেন না। উনষষ্ঠিতম বর্ষে বিলাসী জাহাঙ্গীর চিরদিনের জন্য নয়ন মুদিত করিলেন।

জাহাঙ্গীরের চরিত্রে অনেক সদগুণ ছিল কিন্তু অতিরিক্ত মত্তপানে ঐ সকল গুণ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে কঠোরতা, নিষ্ঠুরতাও যেমন ছিল আবার তেমনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও ভদ্র বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। ছবি আঁকিতে ও কবিতা লিখিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। জাহাঙ্গীর নিজের একখানা জীবন-চরিত রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ জীবন-চরিতে তাঁহার রাজত্বের উনিশ বৎসর কালের বিস্তৃত পরিচয় আছে। ঐ জীবন-চরিতখানা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি।

জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজত্বকালে দেশের শাসনের জন্য দ্বাদশটি অনুশাসন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ অনুশাসন-গুলির মধ্যে রাজ্যশাসন সম্পর্কে যে সকল বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ ছিল তজ্জন্ম তিনি উত্তরকালে একজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, রাজনীতিবিদ্যার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। যে জাহাঙ্গীর এক মুহূর্তের জন্য সুরাপাত্র

হস্তচ্যুত করিতেন না তিনি অনুশাসনে এইরূপ বিধান করিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেহ মদ অথবা, অন্য কোনও প্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত অথবা বিক্রয় করিতে পারিবে না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে রাজ্যের মধ্যে প্রজার চরিত্র সংগঠনের জন্য কিরূপ খরদৃষ্টি তাঁহার ছিল। জাহাঙ্গীর ন্যায়পরায়ণ বিচারক ছিলেন বলিয়া আজও তাঁহার নাম গৌরবের সহিত পরিকীর্তিত হইতেছে। জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মচরিতে একস্থানে গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন—“God forbid that in such affairs I should consider princes, and far less that I should consider Amirs.”

শাহজাহান

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের যখন মৃত্যু হইল, তখন শাহজাহান দক্ষিণাভ্যে ছিলেন। এই সুযোগে নুরজাহান তাঁহার জামাতা শাহরিয়ারকে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু নুরজাহান তাঁহার ভ্রাতা আসফখাঁর ষড়যন্ত্রে রূতকার্য্য হইতে পারিলেন না। আসফখাঁ প্রথম অবস্থায় নুরজাহানের পক্ষাবলম্বন



শিবদেব



The Online Library of Bangla Books

BANGLA BOOK.ORG

করিলেও জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তিনি নূরজাহানকে পরিত্যাগ করিয়া শাহজাহানকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শাহজাহানের দক্ষিণাপথ হইতে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে কয়েকদিন বিলম্ব হইতে পারে এবং সেই অবসরে রাজ্য মধ্যে অশান্তি ও গোলযোগের সৃষ্টি হইতে পারে এইজন্য আসফখাঁ খসরুর পুত্র দাওয়ারবক্সকে সম্রাট বদিয়া ঘোষণা করেন। পরে শাহজাহান যখন নিরাপদে দক্ষিণাপথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আগ্রার নিকটবর্তী হইলেন তখন দাওয়ারবক্স নিহত হইল এবং শাহজাহান সিংহাসনে বসিলেন।

দিল্লীর মুঘল বাদশাহদের মধ্যে শাহজাহান যেমন শান্তি ও সুখের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন, অতি কম সম্রাটের পক্ষেই সেইরূপ সৌভাগ্যের কারণ ঘটিয়াছে।—শাহজাহানের জীবন যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং নাটকীয় ঘট-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া আসিয়াছে দিল্লীর বাদশাহদের অনেকের জীবনেই তদ্রূপ হয় নাই।

আসফখাঁর জীবনের উন্নতির মূলে নূরজাহানের হাত কতখানি ছিল তাহা পূর্বেই লক্ষিত হইয়াছে। তবে আসফখাঁ নূরজাহানকে পরিত্যাগ করিয়া কেন শাহজাহানকে সিংহাসন লাভে সাহায্য করিলেন তাহার ইতিহাসটুকু

বাস্তবিকই কৌতূহলজনক। শাহজাহান আমকর্খার কন্যা আরজমন্দবানুকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহে মূলের প্রণয় ইতিহাসটুকু বড় সুন্দর। মুঘল রাজত্বকালে—বাদশাহের অন্তঃপুরে বৎসরে একবার এক মেলা বসিত, তাহার নাম ছিল খোসরোজ—অর্থাৎ আনন্দের দিন। এই মেলায় রূপসী ললনাদের বাজার মিলিত। একবার এই মেলায় আরজমন্দবানু উপস্থিত ছিলেন। শাহজাহান এক খোসরোজের মেলায় আরজমন্দবানু বেগমকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়া অভিভূত হইলেন এবং সেই অলোকসাধারণ রূপসীর নিকট হইতে একখণ্ড মিস্ত্রী বহু অর্থের বিনিময়ে প্রদ্রব করিলেন। ঐ ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার মন প্রাণও সুন্দরীর চরণ তলে বিকাইয়া দিলেন। এই কথাটা গোপন রহিল না। আরজমন্দবানুর স্বামীর কাণে যখন কথাটা পৌঁছিল, তখন তিনি নানাদিক চিন্তা করিয়া পত্নীকে পুরিত্যাগ করিলেন। শাহজাহান মহাসমারোহে আরজমন্দবানুকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন এবং সিংহাসন লাভ করিবার পর বানুবেগমকে ‘মমতাজমহল’ বা মমতাজমহল অর্থাৎ ‘তৎকালের গৌরব’ এই উপাধি-ভূষণে ভূষিতা করিয়াছিলেন। যতদিন মমতাজ বাঁচিয়াছিলেন ততদিন এই

মহীয়সী, মহিলার আদর, যত্ন ও সেবায় শাহজাহানের জীবন সুখময় হইয়াছিল।

শাহজাহান ছিলেন বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয়। তাঁহার রাজত্বকালে আগ্রা ও দিল্লী বিবিধ সৌধমালায় সুসজ্জিত ও সুশোভিত হইয়াছিল। তিনি বহু সুন্দর নগর এবং সমাধি-মন্দির নির্মাণ করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। দিল্লী ও আগ্রায় যে সকল সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমুদয়ই শাহজাহান নির্মাণ করিয়াছিলেন। দিল্লীর দেওয়ান আম, দেওয়ানখাস ও মতি মসজিদ তিনিই নির্মাণ করিয়াছিলেন। বর্তমান দিল্লী শাহজাহান নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাহার নাম রাখিয়াছিলেন শাহজাহানাবাদ। দিল্লীর দুর্গমধ্যে দেওয়ানী আম ও দেওয়ানী খাস অবস্থিত। খাসে বসিয়াই শাহজাহান দরবার করিতেন।

শাহজাহান যে সিংহাসনের উপর বসিয়া বিচার করিতেন, তাহার নাম ছিল ময়ূরসিংহাসন। পৃথিবীর কোন রাজার এইরূপ মূল্যবান সিংহাসন ছিল না। স্তম্ভের মাথায় মণি-মাণিক্য খচিত এক এক ঘোড়া ময়ূর বসান ছিল। প্রত্যেক ঘোড়া ময়ূরের মাঝখানে এক একটা মণিমাণিক্য দ্বারা গঠিত গাছ ছিল। ইহা এমন

ভাবে গঠিত ছিল, মনে হইত যেন ময়ূর দুইটি ঠোঁকরাইয়া গাছের ফল খাইতেছে। এই সিংহাসন মূল্যবান হীরা, মণি, মুক্তা দ্বারা শোভিত ছিল। কাজেই ইহা নির্মাণে তাঁহার ব্যয় পড়িয়াছিল দশকোটি টাকা। এইরূপ ভাবে তাঁহার রাজমুকুট, সাজপোষাক সমুদয়ই বহু মূল্যবান ছিল। কোন বাদশাহের আমলেই এত জাঁকজমক ছিলনা। শাহজাহানের অমর কীর্তি জগদ্বিখ্যাত আগ্রার তাজমহল। এমন সুন্দর সমাধি-মন্দির পৃথিবীতে আর একটিও নাই।

শাহজাহান মমতাজমহলকে কিরূপ ভালবাসিতেন সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কি যুদ্ধ যাত্রায়, কি ভ্রমণে, কি স্থির হইয়া বাসকালে কখনও শাহজাহানকে ছাড়িয়া মমতাজমহল থাকিতেন না। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে মমতাজমহল শাহজাহানের সহিত বুহারনপুরে যান, সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেবলমাত্র উনচল্লিশবৎসর বয়সে সন্তান প্রসবের সময় ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মমতাজমহলের দেহ সাময়িকভাবে বুহারনপুরে সমাধিস্থ করিয়া দেয়া হয়, ছয়মাস পরে তাঁহার মৃতদেহ আগ্রায় আনিয়া যমুনার তীরে সমাধি দেওয়া হয়। সেই সমাধির উপরে যে সুন্দর সমাধি-মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহাই তাজমহল

নাগে পরিচিত। নানাদেশ হইতে মূল্যবান প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া নানাদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী আনাইয়া বহু পরিশ্রমে বহুটাকা ব্যয়ে বাইশবৎসর কাল পরিশ্রমের পর এই সমাধি মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্মাণ আরম্ভ হয় আর ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ-কার্য শেষ হয়। মমতাজমহলের নাম অনুসারে ইহা তাজমহল নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তাজমহলে খেত প্রস্তরের উপর বহু মূল্যবান বিবিধ বর্ণের পাথর দিয়া লতা পাতা এমন সুন্দর ভাবে সজ্জিত হইয়াছে যে, যেন ইহা সত্য সত্যই স্বপ্নের ছবি।

শাহজাহানের শেষ জীবন বড় অশান্তিতে কাটিয়াছিল। তাঁহার কঠিন পীড়া হইলে, তাঁহার চারি পুত্র—দারা, সুজা, আওরঙ্গজীব ও মোরাদ রাজলাভের জন্য পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি করিয়া তাহার জীবন অশান্তিময় করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে তিন বৎসর যুদ্ধ চলিয়াছিল। অবশেষে তাঁহার তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজীব জয়ী হইয়া বৃদ্ধ শাহজাহানকে বন্দী করিয়া রাখেন। আট বৎসর বন্দী থাকিয়া অবশেষে শাহজাহানের মৃত্যু হয়। শাহজাহানের দেহও তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী মমতাজমহলের সমাধির পার্শ্বেই সমাহিত করা হইয়াছিল।

শাহজাহানের জীবিত অবস্থায়ই রাজ্যলাভের জন্য রাজপুত্রগণ যেরূপ শোচনীয় ভাবে যুদ্ধ কার্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া পরস্পরের রক্তপাত করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে আওরঙ্গজীবের শঠতা চাতুরী এবং নিষ্ঠুরতা কোনরূপেই সমর্থনযোগ্য নহে। আওরঙ্গজীব কৌশল করিয়া মুরাদবল্লকে বন্দী করিয়াছিলেন, সূজার সহিত যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইলেও বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দীর শঠতায় মুরাদকেও জিৎবাজী হারিতে হইল। মুরাদ গেরা নিহারের কারাগারে বন্দী রহিলেন। আর দারা—দারার কন্ঠের একশেষ হইয়াছিল। সিন্ধুদেশে নির্বাসিত অবস্থায় তিনি বাস করিতেছিলেন। নানারূপ অবস্থাস্থুরের ভিতর দিয়া দারা অতিকষ্টে গুজরাটে গিয়া সেখানকার শাসনকর্তার সাহায্যে একদল সেনা গঠন করিয়া আগাভিগুণে অগ্রসর হন। আজমীরের নিকট ঔরঙ্গজীব কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন কালে অবশেষে বোলানে গিরিসঙ্কটের নিকটবর্তী দাদর নামক স্থানের নায়ক জিহন খাঁ নামক এক আফগান বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাঁহাকে ঔরঙ্গজীবের নিকট ধরাইয়া দিলেন। এইখানেই তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর অনাহারে ও কষ্টে মৃত্যু হইয়াছিল।

“দারা কারাগারে রাজকুমার সেপেরশোকোর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রচারিত হইবার পর আওরংজীবের অনুচরগণ তাঁহার নিকট হইতে রাজকুমারকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেল। তিনি এই ঘটনায় মৃত্যু আসন্ন বৃত্তিতে পারিয়া, শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। মৃত্যুর প্রাকালে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ জন্মিল। তিনি একজন খ্রীষ্টধর্ম্মযাজককে কারাকক্ষে আনয়ন করিবার অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু এ অনুমতি পাইলেন না। এই দুর্দ্দশার সময় তিনি ঈশ্বরের করুণাপাতের প্রত্যাশী হইলেন। এই সময়ে নাজির নামক এক ছুরাত্মা দারাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে কারাকক্ষে প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল। দারার ছিন্নমস্তক আওরংজীবের নিকট নীত হইল। আওরংজীব, উহা যথার্থই দারার মস্তক কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, এবং তাহার পর সেই শির কারাকক্ষে পিটার নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। বোর্নিয়ার লিখিয়াছেন—আওরংজীব দারার ছিন্ন মস্তক পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন—

“Ah (Ali) Badbakt! A wretched one!

let this Shocking sight no more offend my eyes, but take away the head and let it be buried in Humayon's Tomb [মোসলবংশ ২৬৮ পৃ] বিচারের মিথ্যা অভিনয়ে এই ভাবে মহাপ্রাণ দারাশাকোর জীবন নিঃশেষ হইয়াছিল। মুরাদও বিচারাভিনয়ের কৌশলে জর্জরিত হইয়া আওরংজীবের কঠোর আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

শাহজাহানের বন্দী অবস্থায় আওরংজীব তাঁহার প্রতি ভক্তি সম্মানজনক ব্যবহার করিতেন। ঐতিহাসিক বোর্নিয়ার বলেন যে ঐ সময়ে তিনি প্রত্যেক বিষয়ে পিতার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কাজ করিতেন—এক স্বাধীনতা ব্যতীত আওরংজীব সর্ববিষয়েই পিতার মনোরঞ্জন করিতেন। কথিত আছে যে, পিতা পুত্রের সমুদয় অপরাধ মার্জনা করিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই।

শাহজাহানের বন্দী অবস্থায় তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা জাহানারা ভক্তিপূর্ণ সেবার দ্বারা পিতার বিষাদ-ক্লিষ্টজীবনে কিয়ৎপরিমাণে শান্তিদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে যুগের ঐতিহাসিকগণ জাহানারাকে পিতৃশ্রদ্ধাপরায়ণা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। শাহজাহান তাঁহাকে আদর করিয়া “পাদশাহ বেগম” উপাধি প্রদান করিয়া-

ছিলেন। কি সামরিক ব্যাপারে, কি রাজনৈতিক মন্ত্রণায়, কি সেবা ও যত্নে—সর্ববিষয়েই তিনি পিতার একান্ত হিতৈষিনী ছিলেন। আওরংজেব শাহজাহানকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলে জাহানশাহ পিতার সেবাসুশ্রাবার জন্য কারাবরণ করিয়াছিলেন।

পুরাতন দিল্লী হইতে নূতন দিল্লীতে আসিতে পথে যে প্রকাণ্ড সমাধিস্থান দেখিতে পাওয়া যায় সেখানে জাহানারার ক্ষুদ্র মর্ম্মর কবরটি অবস্থিত। মধ্যস্থান শ্যামল দুর্ব্বাদলে শোভিত। কবরের শীর্ষ দেশে জাহানারার নিজের রচিত একটী কবিতা লিখিত আছে,—

“বহুমূল্য আভরণে করিওনা সুষাঙ্কিত
কবর আমার।

তৃণ শ্রেষ্ঠ আবরণ দীনা আত্মা জাহানার
সম্রাট কন্যার।”

আওরংজীব আলমগীর

আওরংজীব 'আলমগীর' উপাধি ধারণ করিয়া আশ্রয় সিংহাসনে বসিলেন এবং একে একে ভাইদের পরাজিত এবং নিহত করিলেন। মধ্যম ভ্রাতা সুজা আরাকান রাজ্যে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে যাইয়া সেখানে প্রাণ হারাইলেন। এই ভাবে নিরাপদ হইয়া তিনি সিংহাসনে বসিলেন।

আকবর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে প্রীতি স্থাপন করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান যে রীতির অনুসরণ করিয়া শাস্তিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, আওরংজীব সে ভাবে রাজ্য শাসনের দিকে মন দিলেন না। তিনি গোড়া মুসলমান ছিলেন, রাজ্য লাভ করিয়াই অনুদার ধর্ম-মতের দিকে মন দিলেন। তাঁহার এইরূপ পরধর্ম-বিদ্বেষই মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষয়-পতনের কারণ হইয়াছিল। আওরংজীব প্রথমেই হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর বসাইয়া দিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বেশ প্রীতি ও মিলনের ভাব ছিল, সেই ভাবের সহসা এইরূপ পরিবর্তন দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। যে সকল কাজে হিন্দু কর্মচারী ছিল,

তিনি তাহাঙ্গিকে ভাড়াইয়া সে স্থানে মুসলমান কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। চিতোরের রাণা রাজসিংহ তাঁহার এইরূপ জাতি বিদ্বেষ দেখিয়া বন্ধুভাবে সৎপরামর্শ দিয়া তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত ফল ফলিল।

আওরংজীব রাণার উপর চটিয়া গেলেন। রাজপুতেরাও

আওরংজীবের এত অত্যাচার সহ
রাজপুতদের
সহিত কলহ
করিলেন না। উদয়পুরের রাণা
রাজসিংহ মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

রাজপুতানার প্রধান প্রধান রাজারাও আসিয়া রাণার সহিত যোগদান করিলেন। আওরংজীব যুদ্ধে পরাজিত হইলেন, এবং বেশ বুদ্ধিতে পারিলেন যে, রাজপুতদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করা বড় সহজ নহে। অবশেষে বাধ্য হইয়া রাজপুতদের সহিত তাঁহার সন্ধি করিতে হইল। রাজপুতানার রাজারা এই সুযোগে একরূপ স্বাধীন হইয়া গেলেন।

এই সময়ে ধীরে ধীরে আওরংজীবের এক প্রবল শত্রু মহারাষ্ট্র দেশে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। আওরংজীব কাহারও সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলেন নাই। সে সময়ে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি কয়েকটা মুসলমান রাজ্য

ছিল। ইহারা ভিন্নশ্রেণীর মুসলমান ছিলেন বলিয়া তিনি তাহাদিগকে হিন্দুর ন্যায় ঘৃণা করিতেন। যদি তাহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে হয়ত মারহাট্টারা প্রবল হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইত না। কিন্তু তাঁহার নিজের ক্রটীবশতঃই মারহাট্টারা শিবাজীর অধীনে শক্তিশালী হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইল।

দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজা ছাড়িয়া দিয়া শেষ জীবনে আওরঙ্গজীবকে মারহাট্টাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রায় বাইশ বৎসর কাল যুদ্ধ করিয়াও কোন মতেই তাহাদিগকে দমন করিতে পারেন নাই। এই ভাবে নানা অনশ্রু ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে করিতে তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। একবার যুদ্ধের কঠোর পরিশ্রমের পর দিল্লী ফিরিবার পথে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আওরঙ্গজীব মুসলমান ধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। যুদ্ধের

আওরঙ্গজীবের

চরিত্র

সময় চারিদিক হইতে নানা গোলা-

গুলি ছুড়িয়া আসিতেছে, সেইরূপ

সময়েও যেমন নমাজের সময় উপ-

স্থিত হইয়াছে, অমনি অশ্রুপূর্ণ হইতে নামিয়া নমাজ পড়িতেন।

এদিকে নিজের সুখ-সুবিধার জন্য রাজকোষের এক কপর্দকও ব্যয় করিতেন না। বই নকল করিয়া, টুপী সেলাই করিয়া, এবং তাহা বিক্রয় করিয়া নিজের খরচ চালাইতেন। তিনি মস্ত স্পর্শও করিতেন না, কোনরূপ ভোগ-বিন্যাসও ভালবাসিতেন না।

তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে আওরংজীবের মৃত ক্রমতাশালী সম্রাট আপনার সমাধি-ব্যয় নির্বাহের জন্য মাত্র চারি টাকা দুই আনা রাখিয়া গিয়াছিলেন। পূর্বের মুঘল দরবারে গায়ক, চিত্রকর, প্রভৃতি শিল্পীদের অত্যন্ত সমাদর ছিল। আওরংজীব সে সমুদয় তুলিয়া দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। একবার কয়েকজন গায়ক, একটা কৃত্রিম শব প্রস্তুত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আওরংজীবের বাস-গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। আওরংজীব কোতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কে মরিয়াছে? তোমরা এত কাঁদিতেছ কেন?” তাহারা বলিল, “সঙ্গীতের মৃত্যু হইয়াছে—আমরা কবর দিতে চলিয়াছি।” আওরংজীব বলিলেন,—“কবর ভাল করিয়া কবর দিও”—যেন আর না উঠিতে পারে।

আওরংজীবের প্রধান শত্রু ছিলেন শিবাজী। শিবাজীর সহিত তাঁহার কুলহ ও যুদ্ধের বিষয় পরে বলিতোছ।

আওরংজীবের রাজত্বকালেও বাঙ্গালা দেশের

রাজধানী ছিল ঢাকা। আওরং-

বাঙ্গালা

জীব তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতি

মীরজুমলাকে বঙ্গদেশের সুবেদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। মীরজুমলা বঙ্গ দেশে আসিবার অব্যবহিত পরেই আসাম আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বৃষ্টি ও বর্ষার জন্য তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। আসামবাসীরা বিশেষ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে। তাঁহাদের আক্রমণে মীরজুমলা বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মড়ক লাগিয়া মীরজুমলার অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল এবং মীরজুমলা নিজেও আশ্রয় হ্রোণে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মীরজুমলার পরে নবাব শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলার সুবেদার হইলেন। ঢাকার রাজধানীতে শায়েস্তা খাঁর অনেক কীর্তি আছে। শায়েস্তা খাঁ ত্রিশ বৎসর কাল বাঙ্গালা দেশ শাসন করেন। তাঁহার এই শাসনকালকে সুবর্ণ যুগ বলা যাইতে পারে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই ইরাজেরা বঙ্গদেশে

ইরাজদের

বাণিজ্য বিস্তার

তাঁহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন

করেন। শাহজাহানের পুত্র শাহ

সুজা যখন বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার

শাসনকর্তা ছিলেন, সে সময়ে সুবিখ্যাত ইংরাজ কোম্পানী
 বার্ষিক তিন হাজার টাকা খাজনা দিতে স্বীকৃত হইয়া
 বিনা মাশুলে বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি
 পাইয়াছিলেন। আওরংজীবের রাজত্বকালে বাঙ্গলা দেশে
 ইংরাজদের কুটিগুলির অবস্থা ভাল ছিল না। সম্রাট
 আওরংজীব কোম্পানীকে বাঙ্গলা দেশে স্থান ক্রয় করিয়া
 আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ নির্মাণ করিতে অনুমতি দেওয়ায়, ও
 বণিকগণ ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে আওরংজীবের পৌত্র আজি
 মুশানের অনুমতি অনুসারে কলিকাতা, সূতানুটি গোবিন্দপুর
 এই তিনটি জলা ভূমি ক্রয় করিয়া একটি দুর্গ নির্মাণ
 করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিশেষ ভৃত্য জব
 চার্নক কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। ইংলণ্ডের রাজা
 তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে কলিকাতায় নির্মিত
 দুর্গের নাম ফোর্ট উইলম দেওয়া হইয়াছিল। বাগবাজারের
 খাল হইতে বড়বাজার পর্য্যন্ত স্থানটিকে সূতানুটি
 বলিত। বড়বাজার হইতে লাট সাহেবের বর্তমান
 বাড়ী পর্য্যন্ত স্থানটি কলিকাতা নামে খ্যাত ছিল; লাট
 সাহেবের বাড়ী হইতে ভবানীপুরের উত্তর পর্য্যন্ত স্থানটির
 নাম ছিল গোবিন্দপুর। এই তিন গ্রামের সমষ্টিই বর্তমান
 কলিকাতা। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা মাদ্রাজে এক

কুঠি নির্মাণ করিয়া ইহা রক্ষা করিবার জন্য দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন কোর্ট সেন্ট জর্জ। মাদ্রাজেই ইংরাজদের প্রধান স্থায়ী কুঠি হইল। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে পর্তুগাজ রাজকুমারী ক্যাথারাইনের সহিত ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহ হয়। এই বিবাহে পর্তুগালের রাজা জামাতাকে বোম্বাই দ্বীপ যৌতুক স্বরূপ দান করেন। দ্বিতীয় চার্লস মাত্র দশ পাউণ্ড অর্থাৎ দেড়শত টাকা বার্ষিক কর ধাৰ্য্য করিয়া উহার সমুদয় স্বহ কেম্পানীকে অর্পণ করেন। তখন বোম্বাই একটা সামান্য দীঘর পল্লী মাত্র ছিল। চারিদিকে নীল সাগরের চঞ্চল জল; মাঝখানে এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। ইংরাজদের কাছে এই সুরক্ষিত স্থানটী বড়ই সুন্দর লাগিল; তাহারা এইখানেই পশ্চিম ভারতের কেন্দ্র স্থান করিয়া কুঠি স্থাপন করিলেন। এই ভাবে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে ইচ্ছা ইচ্ছিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের তিনটা কেন্দ্র স্থান স্থাপিত হইল। কলিকাতার ঐ সময় হইতে ধীরে ধীরে কেমন করিয়া বৃহৎ ও সুন্দর নগরী বাড়িয়া উঠিল সে সব কথা পরে জানিতে পারিবে।

মুন্সিফাবাদ—বাক্সালার সুবাদার, ইসলাম খাঁ।

রাজমহল হইতে ঢাকার রাজধানী স্থাপন করেন, সে কথা আগেই বলিয়াছি। বাদশাহ আকবরের সময় হইতেই সুবার সুবেদার বা নাজিম ও দেওয়ান নামে দুইজন কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। একজন শাসন সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতেন আর একজন রাজস্ব ইত্যাদি আদায়ের ব্যবস্থা করিতেন। আওরাজীব এই দুইজনের কাজের ভার বেশ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তবে দুইজনেরই বাদশাহের আদেশ অনুসারে কাজ করিতে হইত।

আজি মুশান যখন বাঙ্গলার সুবেদার সে সময়ে আওরাজীব তাঁহার রাজস্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রিয় মুর্শিদকুলি খাঁকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গলা দেশে পাঠাইয়াছিলেন, কেন না এ সময়ে বাঙ্গলা দেশ হইতে উপযুক্ত রাজস্ব দিল্লীতে যাইত না। মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙ্গলা দেশে আসিয়া এবিষয়ে বিশেষ সু-ব্যবস্থা করিলেন এবং রাজস্ব সংগ্রহ ও রাজকার্যের সমস্ত কর্তৃত্ব দেওয়ান নিজের হাতে গ্রহণ করিলেন। আজি মুশান এই সব ব্যাপারে মুর্শিদকুলি খাঁর উপর নির্ভর ছিলেন না। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলি খাঁ ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় হইতে ঢাকার অধঃপতনের সূত্রপাত। কিন্তু মুর্শিদ কুলি খাঁর রাজস্ব

বিভাগের মধ্যে ঢাকা ১৩ চাকলার প্রধান চাকলা ছিল। ঢাকার চক্ বাজারটা মুর্শিদ কুলি খাঁ তৈয়ারী করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। মুর্শিদাবাদ আসিবার এক বৎসর পরে দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ হিসাব নিকাশের কাগজ পত্র লইয়া দাক্ষিণাত্যে বাদশাহ আওরঙ্গজীবের শিবিরে গমন করিয়া রাজস্ব হিসাবে অনেক টাকা বাদশাহকে দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা হইতে অনেকদিন এইরূপ প্রচুর অর্থ বাদশাহের নিকট প্রেরিত হয় নাই। সুতরাং দেওয়ানের কার্যকুশলতার বাদশাহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে খাঁ উপাধি ও উৎকৃষ্ট খেলাৎ ইত্যাদি প্রদান করেন।

বাদশাহের নিকট হইতে এই সম্মান লাভ করিয়া আসিয়া মুর্শিদ কুলি খাঁ মুখসুদাদাকে নিজের নামানুসারে মুর্শিদাবাদ নাম দিলেন। এবং একটা টাকশাল স্থাপন করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে মুদ্রিত মুদ্রা প্রচার আরম্ভ করেন। কেহ কেহ বলেন মুখসুদাদাদের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন মুখসুম খাঁ নামে একজন ব্যবসায়ী। কাহারো কাহারও মতে মুর্শিদাবাদ নবাব আকবর বাদশাহের সময় নির্মিত। আইন-আকবরীতে মুর্শিদাবাদের নাম নাই। আকবর নামায় মুখসুম নামে একজন শাসনকর্তার

নাম পাওয়া যায়। সে যাহাই হউক না কেন, মুর্শিদকুলি খাঁর সময় হইতেই মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধি।

মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী হওয়ায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসই অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস। সম্রাট আওরংজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন লইয়া নানা গোলযোগের সৃষ্টি হয়। বাদশাহ ফরক্ শায়ারের নিকট হইতে মুর্শিদকুলি খাঁ নাজিম ও দেওয়ানের পদ লাভ করিয়া বাঙ্গালার সর্ব্বময় কর্তা হইয়া বসিলেন। এ সময় হইতে নানারূপে মুর্শিদাবাদের উন্নতি হইতে আরম্ভ করে। মুর্শিদকুলি খাঁ সুবেদার হইয়া বাঙ্গালার মুসলমান রাজত্বের প্রকৃত ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে মুর্শিদাবাদ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে এবং ইয়োরোপীয় নানা জাতীয় লোকের ব্যবসায়ের কেন্দ্র রূপে খ্যাতি লাভ করে। পলাসীর রণক্ষেত্রে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী, বৃহৎ ও সুন্দর নগর এবং কৃষিসায় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। মুর্শিদাবাদের ভাগ্য-পরিবর্তন—তাহার অধঃপতন পলাসীর যুদ্ধের পর হইতেই আরম্ভ হয়।

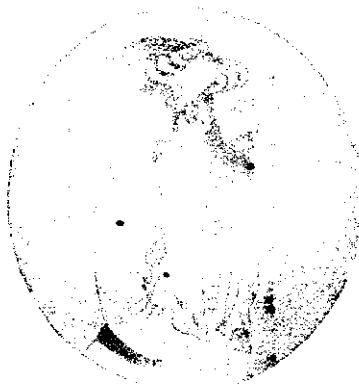
আওরংজীবের শাসন নীতি মুঘল সাম্রাজ্য পতনের কারণ। আওরংজীব দীর্ঘ আওরংজীবের শাসন-নীতি আটচল্লিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আহমেদনগরে পরলোক গমন করেন। যে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ লইয়া তাঁহার জীবনের প্রায় পঁচিশ বৎসর কাটিয়াছিল, সেই দাক্ষিণাত্যেই তাঁহার সমাধি ক্ষেত্র হইল। আওরংজীব চরিত্রবান ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি সাহসী ও সুদক্ষ সেনাপতি, কার্যকুশল জ্ঞানী, চতুর ও বিশেষ উद्यোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি খাঁজী মুসলমানের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার কোনরূপ আমোদ প্রমোদ বা বিলাসের প্রতি মন ছিল না। আওরংজীব শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান ছিলেন, নিজে দেখিয়া শুনিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু এসকল গুণ থাকিলে কি হইবে, এক উদারতার অভাবেই তিনি আকবরের সুবিস্তৃত রাজ্য নাশ করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বাস করিয়া জিনিস তাঁহার মনে একেবারেই ছিল না। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, এক যুদ্ধে দুইজন সেনাপতি পাঠাইয়া উভয়ের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিতেন, ফলে কেহই উৎসাহ সহকারে কাজ করিত না। তিনি বৃদ্ধ পিতার প্রতি যেরূপ অন্যায়

ও কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে কনই মিলে। কৃতজ্ঞতা বলিয়া কোনও জিনিষ তাঁহার মনের কোনেও স্থান পাইত না। তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্যদিগকেও তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। এমন কি আপনার নিজের পুত্রগণকেও বিশ্বাস করিতেন না। মীরজুমলা, জয়সিংহ, যশোবন্তসিংহ, প্রভৃতি সেনাপতির মৃত্যুতে তিনি আনন্দ বোধ করিতেন।

আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান যে নীতি অবলম্বন করিয়া রাজশাসন করিয়াছিলেন সেই পথে চলিলে মুঘল-সাম্রাজ্য আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংস পাইত না। আকবরের উদারনীতির ফলে যেমন শত্রু ও মিত্র হইয়াছিল, তেমনি আওরঙ্গজেবের সন্ধীর্ণতার কালে বিশ্বাসী বন্ধুও শত্রুতে পরিণত হইয়াছিল। আওরঙ্গজেব হিন্দু প্রজাদের প্রতি উদারতা দেখাইতে না পারায় হিন্দু প্রজাদের মধ্যে বিরক্তি ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি সূর্য্যজারদের উপর হুকুম দিয়া হিন্দুর দেবমন্দির ও মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া, হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসের উপর আঘাত দিয়া তাহা-দিগকে লালিত করিতেন। আওরঙ্গজেব ভারতবর্ষকে মুসল-মান রাজ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার ফলেই তাঁহার জীবন বিদ্রোহ ও অশান্তির মধ্য দিয়াই কাটিয়া গেল।

আওরংজীবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের বিশেষ উন্নতি হইলেও তাঁহার অনুদার নীতির ফলে—তাঁহার মৃত্যুর পর পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যেই রাজবংশের গৌরব লোপ পাইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে যে কয়জন মুঘল বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই তেমন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। আওরংজীবের রাজত্বের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে মহম্মদ শাহ যখন দিল্লীর সম্রাট, তখন পারস্য দেশের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন। নাদির দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর ছিলেন। ছয় ফিট লম্বা, বিকট কাহলা মুখ, কর্কশ স্বর আর বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল ছিল তাঁর চক্ষু দুইটা। তাঁহাকে দেখিলেই লোকে ভয় পাইত। নাদির দিল্লীর রাজপথ নররক্তশ্রোতে ভাসাইয়া এবং আটায় দিন পর্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া দিল্লীর সমুদয় ধনরত্ন মগ্নমুক্ত লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি শাহ-জাহানের ময়ূর সিংহাসনখানাও পারস্যদেশে লইয়া গেলেন। নাদির শাহের এই আক্রমণে দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্য একরূপ লোপ পাইল। মুঘল সম্রাটেরা নামে মাত্র বাদশাহ রহিলেন। মারহাট্টারা এসময়ে প্রবল শক্তিমান, তাঁহারা মুঘল সম্রাটের নিকট হইতে জীথ আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন। শিবাজীর অভ্যুদয় ইতিহাসে একটা স্মরণীয়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG



Digitized by www.banglabook.org

ঘটনা। শিবাজীর সহিত আওরঙ্গজীবের সারা জীবনই প্রায়
অশান্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটিয়া গিয়াছিল। এইবার সেই
কথা বলিতেছি

শিবাজী মহারাজ

পশ্চিম ভারতের পার্শ্বপ্রদেশ মহারাষ্ট্র দেশ নামে পরিচিত।
এ দেশের অধিবাসীরা মহারাষ্ট্রীয় নামে খ্যাত। আওরঙ্গজীব
যখন ভারত-সম্রাট, সে সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে যে সকল
জায়গীরদার ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন
শাহজী। শিবাজী এই শাহজীর পুত্র। শাহজী একজন
বীর পুরুষ ছিলেন। বিজাপুরের সুলতানের অধীনে তিনি
একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

শিবাজী বাল্যকালে তাঁহার মাতার সহিত পুনায়
থাকিতেন। দাদাজী কাহ্নদেব নামে শাহজীর একজন বিশ্বস্ত
মন্ত্রী ছিলেন, তিনি শিবাজীর অভিভাবক হইলেন। বাল্য
কাল হইতেই শিবাজী দাদাজীর
শিবাজীর বাল্য জীবন নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।
শিবাজী কখনও লেখাপড়া শিখেন নাই। অল্প বয়সেই তীর

ধনুকের ব্যবহার, অশ্বারোহণ, এসব বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ ছিল। দাদাজী রাধায়ণ ও মহাভারত পড়িতেন, শিবাজী তাহার নিকট ভীষ্ম, দ্রোণ, কৰ্ণ, রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতির বীরত্বের গল্প শুনিতেন; শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিত এবং তাঁহাদের মত একজন বীর হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিত।

শিবাজীর বয়স যখন ষোল বৎসর, তাঁহার সমবয়সী কতকগুলি যুবককে লইয়া তিনি একটী দল গঠন করিলেন। গ্রাহাদিগকে লইয়া তিনি পাহাড়ে পাহাড়ে কিরিতেন এবং কোথায় পথ আছে, কোন্ পথে কোন্ দুর্গে যাওয়া যায় এসবের খোঁজ লইতেন, আর সুবিধা পাইলেই লুটপাট করিতেন। পাহাড়ের উপর দুর্গগুলি অবস্থিত ছিল। শিবাজীর এসময় হইতেই স্বাধীন হিন্দু রাজা হইবার ইচ্ছা হইয়াছিল। উনিশ বৎসর বয়সে শিবাজী তোরণ দুর্গ অধিকার করিয়া সেখানকার জমিদারদের নিকট হইতে কর আদায় করিতে লাগিলেন, এবং একটী পর একটী করিয়া কতকগুলি দুর্গ দখল করিলেন। পর বৎসর রায়গড় নামে নিজেই একটী দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিলেন। বিজাপুরের সুলতান সে সময় মহারাষ্ট্রদেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি শিবাজীর এই সকল দুর্গ বিজয়ের সংবাদ

অবগত হইয়া শিবাজীর পিতা শাহজীকে বন্দী করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে শিবাজী এ-সকল কাজ পিতার মত লইয়াই করিতেছেন। শিবাজী পিতার উদ্ধার করিলেন। এদিকে শিবাজী কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না, পূর্বের ন্যায় অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন, বিজাপুরের সুলতান তাঁহাকে দমন করিবার জন্য আফজল খাঁ নামে একজন সেনাপতিকে পাঠাইলেন।

আফজল খাঁ অনেক সৈন্য ও কামান লইয়া শিবাজীকে দমন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। ইনি আসিবার সময় শিবাজী ও আফজল খাঁ সুলতানকে অভিযয় গর্বেবর সহিত বলিয়াছিলেন যে এই বিদ্রোহীকে অতি সহজেই শিকলে বাঁধিয়া সুলতানের পায়ের কাছে হাজির করিয়া দিবেন। শিবাজী দেখিলেন, এতগুলি সৈন্যের সম্মুখে যুদ্ধ করা অসম্ভব, তাই তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কথাবার্তা ঠিক করিবার :জন্য প্রতাপগড় দুর্গের নিকট উভয়ের সাক্ষাৎ স্থির হইল। শিবাজী ও আফজল খাঁ প্রত্যেকেই দুইজন শরীর রক্ষক বা অনুচর সঙ্গে লইয়া প্রতাপ-গড়ের সম্মুখে একস্থানে সাক্ষাৎ করিলেন। শিবাজী পূর্ব হইতেই অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন—আফজল খাঁর অভিপ্রায় বড

ভাল নহে। তিনি এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে সাম্রাজ্যের সময় শিবাজীকে বন্দী করিবেন, কারণ শিবাজীর মত ধূর্তকে বশ করা বড় সহজ কথা নহে। কাজেই শিবাজী আত্মরক্ষার পন্থা করিয়াছিলেন। * তিনি জামার নীচে ছোট লুকাইয়া লোহার জালের বর্ম এবং পাগড়ীর নীচে ছোট কড়াইয়ের মত ইম্পাতের টুপী রাখায় পরিয়াছিলেন। বাহির হইতে দেখিলে বুঝিবার বো নাই যে তাঁহার বাম হাতের আঙ্গুলে কড়া দিয়া লাগানো 'বাঘনখ' নামক তীক্ষ্ণ বাঁকা ইম্পাতের নখরগুলি মুঠির মধ্যে লুকানো ছিল। আর ডান হাতের আঙ্গুলের নীচে 'বিছুরা' নামক সরু ছোরা ঢাকা ছিল। তাঁহার সঙ্গে ছিল তলোয়ার খেলায় দক্ষ দুইজন শরীর-রক্ষক—জীব মহালা * নামক নাপিত এবং শস্ত্রজ্ঞ। উভয়েই অসম সাহসী, ক্রিপ্রহস্ত, তেজীয়া পুরুষ। ইহাদের প্রত্যেকের হস্তে দুইখানা তরবারি ছিল।

যে সন্ধ্যায় শিবাজীর সহিত আফজল খাঁ দেখা হইল—সেই সন্ধ্যায় মধ্যস্থলে যে বেদীর মত উচুস্থানে আফজল খাঁ বসিয়াছিলেন, শিবাজী তাহার উপর চড়িলেন। শিবাজী দেখিতে নিরস্ত, কিন্তু আফজল খাঁর কোমরে

* অনেক মুসলমান ঐতিহাসিক কিন্তু বলেন যে আফজল খাঁর এক্ষণ কোন অসমভিপ্রায় ছিলনা।

তলোয়ার খুলিতেছে। আফজল খাঁ যদি হইতে উঠিয়া কয়েক পা অগ্রসর হইয়া শিবাজীকে আনিঙ্গন করিবার জন্য দুই বাহু বিস্তার করিয়া দিলেন। শিবাজী ছিলেন বেঁটে ও সরু, আফজলের কাঁধ পর্য্যন্ত উঁচু, সুতরাং খাঁর বাহু দুটি শিবাজীর গলা ঘিরিল। তার পর হঠাৎ আফজল খাঁ শিবাজীর গলা নিজ বাম বাহু দিয়া দৃঢ়বেষ্টনে চাপিয়া ধরিলেন, এবং ডান হাত দিয়া কোমর হইতে লম্বা ছোরা খুলিয়া শিবাজীর বাম পাঁজরে ঘা মারিলেন। কিন্তু অদৃশ্য বর্ষে ঠেকিয়া ছোরা দেহে প্রবেশ করিতে পারিল না। গলার চাপ লাগিয়া শিবাজীর দমবন্ধ হইবার মত হইল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তে বুদ্ধিস্থির করিয়া তিনি বাম বাহু সজোরে ঘুরাইয়া আফজল খাঁর পেটে বাঘনখ বসাইয়া দিয়া, তাঁহার পাকস্থলির পর্দা বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। খাঁর ভুঁড়ী বাহির হইয়া পড়িল। আর, ডান হাতে বিছুরা লইয়া খাঁর বাম পাঁজরে মারিলেন। যন্ত্রণায় আফজল খাঁর বাহু-বন্ধন শিথিল হইয়া আসিল। এই সুযোগে শিবাজী নিজেকে মুক্ত করিয়া বেদী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নিজে সঙ্গীদের দিকে ছুটিলেন। এসব ঘটনা এক নিমেষে শেষ হইল।

আফজল খাঁ চোঁচাইয়া উঠিলেন—“মারিল...মারিল... আমাকে প্রতারণা ‘করিয়া মারিল।’” অমনি অশুচরেরা ছুটিয়া আসিল। তলোয়ারের ঘায় শিবাজীর পাগড়ীর নীচের লোহার টুপাটা পর্য্যন্ত টোল খাইয়া গেল, কিন্তু মস্তক রক্ষা পাইল। ইতিমধ্যে বাহকেরা আহত আফজলকে প্রাক্ষিতে শোয়াইয়া তাঁহার শিবিরে লইয়া ঘাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শম্ভুজী কাবজি আসিয়া তাহাদের পায়ে কোপ মারায় তাহারা পান্থী ফেলিয়া ছুট দিল। তখন শম্ভুজী আফজল খাঁর মাথা কাটিয়া বিজয় গর্বে তাহা শিবাজীর কাছে উপস্থিত করিল।

আফজল খাঁর মৃত্যু হইলে মারাহাট্টারা মুসলমান সেনাগণকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল। বিজাপুরের সুলতান আর একদল সৈন্য পাঠাইয়াও তাঁহাকে পরাজিত করিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহাকে রাজ্য সীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই শিবাজীর ক্ষমতা, রাজ্য এবং দুর্গের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শিবাজী এখন সুযোগ পাইয়া মুঘল রাজ্য লুটপাট করিতে লাগিলেন। তাঁহার একটু সুযোগও হইল। আওরঙ্গজীব হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষ বহি জ্বলাইয়া দিয়াছিলেন, সে আগুন মারাহাট্টা

দেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। শিবাজী এই সময়ে প্রচার করিলেন যে,—ধর্ম রক্ষার জন্য, গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য তিনি এই যুদ্ধ করিতেছেন, কাজেই ধর্ম রক্ষার জন্য দলে দলে হিন্দু আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি এই পার্বত্য মুখিককে দমন করিবার জন্য দক্ষিণ দেশের শাসন কর্ত্তা শায়েস্তা খাঁকে পঠাইলেন।

শায়েস্তা খাঁ পুনঃ অধিকার করিয়া এবারে শিবাজীর বাড়ী দখল করিলেন। একদিন রাত্রিতে শিবাজী তাঁহার সৈন্য দল হইতে সাহসী পঁচিশ জন সৈন্য বাছিয়া লইয়া, এক বর যাত্রীর দলের সহিত মিশিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং অতর্কিত ভাবে শায়েস্তা খাঁকে আক্রমণ করিলেন। শায়েস্তা খাঁ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছিলেন, জাগিয়া দেখিলেন আর রক্ষা নাই। তখন তিনি একটা জানালা দিয়া এক গাছ দড়ি সাহায্যে নীচে নামিয়া পলায়ন করিলেন। পলায়নের সময় এক ব্যক্তি তাঁহাকে ধড়ং দ্বারা আঘাত করে। কিন্তু তাহা তাঁহার গায়ে না লাগিয়া—একটা মাত্র অঙ্গুলির বিলোপ সাধন করে। শায়েস্তা খাঁর পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সৈন্যদলও পলায়ন করিল।

এই সময়ে শিবাজীর পিতা শাহজীর মৃত্যু হইল। পিতার মৃত্যুর পর শিবাজী 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করিলেন। শিবাজী ইতিমধ্যে সুরাট লুণ্ঠিয়া লইলেন। আওরংজীব এই "পাহাড়িয়া ইন্দুরের" ব্যবহারে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আর এক দল সেনা রাজা জয়সিংহের অধীনে পাঠাইয়া দিলেন। জয়সিংহের নাম, সৈন্য-সংখ্যা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং পরাক্রম শিবাজীর অজানা ছিল না। তাহার সহিত যুদ্ধ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, শিবাজী বিনাযুদ্ধেই সন্ধি করিলেন। শিবাজী মুঘলদের বত্রিশটি দুর্গ জয় করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কুড়িটি নিজ দখলে রাখিয়া বাকী কয়টির অধিকার ত্যাগ করিলেন। কিছুদিন পরে আওরংজীব শিবাজীকে দিল্লী যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। জয়সিংহের পরামর্শে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ

করিবার জন্য তিনি দিল্লী গমন
 শিবাজীর
 দিল্লী গমন করিলেন। কিন্তু তথায় উপস্থিত
 হইলে সম্রাট তাহার রাজসভায়

তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাহগণের সহিত বসিতে আসন দিয়া অপমান করিলেন। কয়েক দিনের অসুখ হইয়া শিবাজী বুঝিতে পারিলেন যে, আওরংজীব তাহাকে দিল্লীতে বন্দীভাবে রাখিতে চাহেন। তখন তিনি পীড়ার ভাণ করিয়া

গৃহের জানালা ও দরজা দিনরাত্র বন্ধ করিয়া
রহিলেন।

শিবাজীর গৃহে দিবারাত্র চিকিৎসক আসিতেছেন ও
বাইতেছেন, শিবাজী বাঁচেন কিনা সন্দেহ! কয়েকদিন
পরে নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে শিবাজী আরোগ্যলাভ
করিয়াছেন। রোগ আরোগ্য উপলক্ষে শিবাজী ব্রাহ্মণ,
সামু ও রোগীদিগকে খুব বড় বড় ঝুড়ি ভরিয়া মিষ্টান্ন বিলি
করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন

শিবাজীর পলায়ন

এইরূপ মিষ্টান্ন বিলির পর,
প্রহরীদের যখন আর কোন সন্দেহের কারণ রহিল না,
তখন একদিন সন্ধ্যার সময় দুইটা প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের ঝুড়ি
শিবাজীর বাড়ী হইতে বাহির হইল। তাহার একটাতে
শিবাজী নিজে এবং অপরটাতে তাঁহার পুত্রকে বসাইয়া-
ছিলেন; কেহ কোন সন্দেহ করিল না। এইরূপ চতুরতা
করিয়া শিবাজী আওরংজেবের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া
নানাস্থানে সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরিতে ঘুরিতে দেশে ফিরিয়া
আসিলেন।

তারপর তিনি নানা যুদ্ধে সেনাদিগকে পরাস্ত
করিয়া দাক্ষিণাত্যে হিন্দু রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়া-
ছিলেন। বাহাদুর বৎসর বয়সে আওরংজীব বাঁচিয়া

থাকিভেই শিবাজীর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। শিবাজীর ন্যায়

শিবাজীর চরিত্র মহাপুরুষ ভারতবর্ষে বড় বেশী জন্ম
গ্রহণ করেন নাই। আপনার

প্রতিভাবলে তিনি একটী বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।
আওরঙ্গজেবের ন্যায় ক্ষমতাশালী পরধর্ম বিদ্বেষী মুঘল
সম্রাটের রাজত্বকালে তাঁহার সহিত সমান ভাবে যুদ্ধ
বিগ্রহ করিয়া শিবাজী হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শিবাজী
মারহাট্টা জাতির মধ্যে যে শক্তি জাগাইয়া দিয়াছিলেন
সেই নবজীবনের শক্তি সহজে লোপ পায় নাই। শিবাজীর
বুদ্ধি, তাঁহার প্রত্নতত্ত্বপন্থিত্ব, সাহস, এবং যুদ্ধ কৌশল
ছিল অসাধারণ। তিনি নিজ ধর্মের দৃঢ় বিশ্বাসী হইলেও
পরধর্ম বিদ্বেষ তাঁহার একেবারেই ছিল না। শিবাজীর
কাছে কোরাণ শারিফ ও মসজিদ তুল্য পবিত্র বলিয়া
বিবেচিত হইত। কোন সময় যদি তাঁহার হাতে কোরাণের
পুঁথি পড়িত তাহা হইলে আপনি মুসলমান অনুচরকে
ডাকিয়া দিতেন। তিনি স্ত্রী জাতিকে অত্যন্ত সম্মান
করিতেন। স্বদেশ, স্বজাতি, ও স্বাধীনতাই ছিল তাঁহার
জীবনের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র সাধনেই তিনি তাঁহার
জীবন দান করিয়া গিয়াছেন।

শিবাজীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র শম্ভুজী রাজা হইয়া-

ছিলেন, কিন্তু আওরঙ্গজীব তাঁহাকে কৌশলে ধরিয়া বধ করিয়াছিলেন। ইহাতেও মারহাট্টারা নিরুৎসাহ হন নাই। শম্ভুজীর পরে রাজারাম এবং তাঁহার স্ত্রী তারাবাই মুঘলরাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আওরঙ্গজীব শেষ বয়সে মারহাট্টাদের উৎপাতে পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবিরাম পরিশ্রমে উন্নতবয়সে বৎসর বয়সে আমেদনগরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

শিবাজীর বংশ লোপ পাইলেও মারহাট্টা শক্তির অগ্রগতি রুদ্ধ হয় নাই। ক্রমে মারহাট্টাদের আরও পাঁচটা রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। মারহাট্টারা এসময়ে সারা ভারতবর্ষে লুণ্ঠিতরাজ করিয়া বেড়াইত এবং মুঘলরাজ্য একেবারে ছারখার করিয়া দিয়াছিল। বাংলার লোকেরাও তাহাদের ভয়ে কাঁপিত। এই মহারাষ্ট্রীয় দস্যুরাই বর্গী নামে পরিচিত।

কয়েক বৎসরের মধ্যে মারহাট্টারা ভীষণ ক্ষমতামালী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তাহারা সমস্ত ভারতের অধিপতি হইবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের কোন ক্ষমতাই ছিল না। তিনি মারহাট্টাদের হাতের পুতুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। মারহাট্টারা যখন এমন শক্তিশালী, সেই সময়ে আফগানিস্থানের সুলতান

আহম্মদশাহ আবদালী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের রণক্ষেত্রে মারাঠারা তাঁহাকে বাধা দিলেন বটে কিন্তু জয়ী হইতে পারিলেন না। এই যুদ্ধে হারিয়া মারাঠাট্টাভ্যতির আশার বাতি নিবিয়া গেল। ইতিহাসে এই যুদ্ধ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আওরংজীব পরলোক গমন করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল। মৃত্যু সময়ে তিনি কাহাকেও সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া রাইতে পারেন নাই। কাজেই জীবিত ভ্রাতাদের মধ্যে সিংহাসন লাভের জন্য একটা কলহ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলা হইতে পারে। অতঃপর নানা যুদ্ধ বিগ্রহের পর শাহজাদা মোয়াজ্জিম বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি সিংহাসনে বসিয়া প্রথমেই আপনার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি মুমিনখাঁকে খান খানান উপাধি দিয়া সম্মানিত করিলেন এবং প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। বাহাদুর শাহ পিতামহ শাহজাহানের মায় ঐশ্বর্যা সম্পদ ও জনাভিলাষী এবং আড়ম্বর-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার দরবার সর্বদা বিবিধ সাজ সজ্জায় সজ্জিত থাকিত। আমীর ওমরাহগণ সর্বদা

বহুমূল্য পোষাক পরিহিত হইয়া তাহার দরবারের শোভা বর্দ্ধন করিতেন।

বাহাদুর শাহ অতি সঙ্কটকালে সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন। আওরংজীব যে সঙ্কীর্ণতা, যে অশুদারতার দ্বারা—হিন্দু জাতির মধ্যে বিদ্বেষের আগুন প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিলেন, বাহাদুর শাহ ঐরূপ অশুদার নীতির পক্ষপাতী না হইলেও তৎকালে দেশের সবাই ঐরূপ হইয়াছিল যে উহার প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না। হিন্দুর মনের মধ্যে—বিদ্বেষের যে আগুন প্রজ্বলিত ছিল—তাহা প্রশমিত না হইয়া এ সময়ে প্রবল আকারই ধারণ করিয়াছিল। আওরংজীবের জীবিতকালেই রাজপুত ও জাঠ জাতি যুদ্ধের বিরুদ্ধে মন্তকোত্তলন করিয়াছিল। এ সময়ে পঞ্চনদে শিখেরা দিন দিন রণ-প্রিয় দুর্ধর্ষ জাতিতে পরিণত হইয়া উঠিতেছিল। তবে বাহিরের শত্রু সকল দ্বারা বাদশাহকে যত না বিপদ হইয়াছিল তাহার চেয়ে অনেক বেশি বিপদ হইয়াছিল গৃহশত্রু হইতে। প্রজাপুরের শাসন কর্তা ভ্রাতা কামবঙ্গ তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই সময়ে আওরংজীবের প্রাচীন সেনাপতি জুলফিকর খাঁ দক্ষিণাপথে ছিলেন, তাহার সহিত কামবঙ্গের

একেবারেই মনের মিল ছিল না। তিনি বাদশাহের অনুমতি না লইয়াই কামবঙ্গকে আক্রমণ করিলেন। মুনিমখাঁ অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিলেও অত্যাঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। জুল তাহাকে বন্দী করিয়া রাজশিবিরে লইয়া গেলেন। তাঁহার জঘ্ন বিজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্ত হইল। কিন্তু অভিমতী কামবঙ্গ কোনরূপ চিকিৎসা ও যত্নের জঘ্ন ব্যস্ত হইলেন না। বাহাদুরশাহ নিজে সন্ধ্যার সময় ভ্রাতার নিকট আসিলেন, নিজ হস্তে সুকর্যা পান করাইলেন এবং চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ভ্রাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কামবঙ্গ বাঁচিলেন না, সেই রাত্রিতেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

জুলফিকরখাঁ দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি মহারাষ্ট্র জাতিকে মুঘল বাদশাহের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে এক করিবার জঘ্ন যত্নবান ছিলেন। এই সময়ে নানাদিক দিয়াই দেশের অতি শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল। রাজপুত জাতির মধ্যে মুঘল বিদ্বেষ নানারূপে প্রকাশিত হইয়া শাসনের বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল এবং শিখজাতি পঞ্চনদ প্রদেশে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে ভীষণভাবে বিদ্রোহ আচরণ করিতেছিল।

বাহাদুরশাহ দেখিলেন এক সঙ্গে রাজপুত ও শিখজাতির সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে তাহার পক্ষে জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। এইজন্য তিনি অশ্বর বোধপুর প্রভৃতি রাজপুত নৃপতিদের সহিত সন্ধি ও সখা স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজপুতদের সহিত বন্ধুত্ব হইবার পরে বাহাদুরশাহ নবজাগরিত শিখশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করিবার জন্য সেনাপতি মুনিমখাঁর অধীনে এক প্রবল সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে শিখদের ভীষণভাবে পরাজয় হইল। মুনিমখাঁ বিজয়ী মুঘল সৈন্যবাহিনী লইয়া মগোরবে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই মুনিমখাঁর মৃত্যু হইল।

এই সময়ে সিয়া ও সূফী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা গোলাযোগ চলিতেছিল। সূফী সম্প্রদায় বলসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল, কাজেই বাদশাহ উভয়পক্ষের কনহা যাহাতে বৃদ্ধি না পায় এবং একটা ধ্বংসকারী ক্রান্তির কারণ না ঘটে, সেইজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। কেননা, মারাঠা, রাজপুত, শিখসকলেই মুঘল রাজশক্তি যাহাতে ধ্বংস পায় সেইজন্য উদ্গ্রীব ছিলেন। সূফী সম্প্রদায়ের গোলাযোগের নিষ্পত্তি হইল না। এই সময়ে

হুমায়ুন জায়গ

হঠাৎ বাহাদুরশাহ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ফলে চারিদিক হইতে সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য একটা ব্যগ্র আয়োজন পড়িয়া গেল। রাজপুরুষেরা নিজ নিজ পৃষ্ঠপোষকগণের পক্ষাবলম্বন করিতে লাগিলেন। রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা অরাজকতা এবং অনিয়ম ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ঠিক এইরূপ অশান্তির সময়ে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বাহাদুর শাহ পরলোক গমন করিল।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক থানি খাঁ বাহাদুর শাহের চরিত্রের সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :—

For generosity, munificence, boundless good nature, extenuation of faults, and forgiveness of offences very few monarchs have been found equal to Bahadur Shah in the histories of the past times, and specially in the race of Timur. But though he had no voice in his character, such complacency and such negligence were exhibited in the protection of the state and in the government and the management of the country, that worthy Sarcastic people found the date of his accession in the words Shah-i-be Khabr, "Heedless King."

জাহান্নার শাহ

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জাহান্নার শাহ সিংহাসন লাভ করিলেন। এই সিংহাসন লাভে দক্ষিণাপথের শ্বেদার জুলকির খাঁ বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্রাট সিংহাসন লাভ করিয়াই ভ্রাতাদের ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া সিংহাসন নিকটক করিলেন। জুলকির খাঁ হইলেন বাদশাহের মন্ত্রী। দক্ষিণাপথের শাসন কার্য দাউদ খাঁ নামক একজন প্রতিনিধির হস্তে সমর্পিত হইল।

জাহান্নার শাহ অযোগ্য, বিলাস-পটু, অলস এবং রাজকার্যের সম্পূর্ণরূপ অযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। লালকুরর নামে একটি কুলটা রমণী বাদশাহের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহাকে বাদশাহ বার্ষিক দুই কোটি টাকা বৃত্তি দিতেন এবং তাঁহার প্রয়োজনীয় বিলাসের উপকরণ, মণিমুক্তার মূল্য এবং বসনভূষণের ব্যয়ও রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইত। এই সময়ে রাজ্যমধ্যে শাসন-শৃঙ্খলা ছিলনা, বিচার বিবেচনা ছিলনা, জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তির সম্মান ছিলনা। ছিল শুধু বিলাস, ভোগ ও ব্যক্তিচারের পূর্ণমাত্রায় প্রভাব। দিবারাত্র নর্তকীর নৃপুত্র নিকনে সেতার ও প্রাঙ্গের সুরধর শুধুনে

রাজনরবার মূখরিত বাকিত। এইরূপ রাজনর নীতাই শেষ হইতে বাধ্য। এই সময়ে আজিমউলখানের পুত্র ফররুখ শিয়র বাঙ্গলা দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। ফররুখ শিয়র বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ করিয়া রাজধানী অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং পথে বিহারে তাহার পিতার বন্ধু ও কর্মচারী হোসেন আলিখাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আলিখাঁ তাহার কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি ফররুখ শিয়রের সহিত যোগদান করিলেন। এলাহাবাদের কাছে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। জুলফিকর খাঁ সম্রাটের পক্ষাবলম্বন করিয়া প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সৈন্য ও মরহাদের জাহান্দর শাহার অত্যাচার ও অন্যচারে এতদূর অসন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাহারা কেহই প্রাণ দিয়া যুদ্ধ করিলেন না। চারিদিক হইতে অশ্রান্ত ভাবে বাণ বর্ষিত হইতে লাগিল। জাহান্দর যে হস্তীতে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই হস্তীও ক্ষেপিয়া উঠিল। তিনি কাপুরুষের মত যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই লালকুয়ারকে লইয়া পলায়ন করিলেন। যুদ্ধ মূর্ত্তা জুলফিকর তবিষ্যত সম্রাটের কৃপালাভের প্রত্যাশায় জাহান্দরশাহকে বন্দী করিলেন।

কররুখশিয়র

এইবার কররুখশিয়র সিংহাসন লাভ করিলেন। তাঁহার আদেশে জাহান্নার লাহ, জুলফিকর খাঁ ও তাঁহার পিতা আফ্‌গ খাঁ অতি নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। আওরংজীবের হিন্দু-বিষেয় বাহাদুর-শাহর রাজ্যশাসনের অযোগ্যতা, জাহান্নার শাহর চরিত্রহীনতা ও বিলাস মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। কররুখশিয়র অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ এবং ভীক স্বভাবের লোক ছিলেন। নিজে বিচার করিয়া কোন কাজ করিবার কৰ্মতা তাঁহার ছিল না। কাজেই সৈয়দ ভ্রাতারা—আবদুল্লা খাঁ এবং হোসেনআলী খাঁ ঘাড়া বলিডেন; জাহাই হইত। ফলে রাজ্যশাসনের সমুদয় কৰ্মতা সৈয়দ ভ্রাতাদের হাতেই গিয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে শিখজাতির পুনরায় প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারা লাহোর হইতে আশ্রয় লয়। সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিল। বাদশাহ শিখদিগকে দমন করিবার জন্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। শিখেরা নিজদের বান মর্যাদা ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। মুঘল সৈন্যেরা সন্মত হইয়া উঠিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য কণতঃ

তাহাদের শিবিরে খাড়াভাবে খটায় তাহারা মুঘলের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। মুঘল সেনাপতি এই সময়ে যে, নৃশংসতার পরিচয় প্রদান করিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠা চিরদিন কলঙ্কিত করিয়া রাখিবে। তিনি দুই হাজার শিশুর শিরচ্ছেদন পূর্বক হিন্নরত্নকণ্ঠনি বাকসাহেব নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। শিশুগুরু বাকসা তাঁহার প্রায় এক সহস্র অশুচর সহ বহু-পদ শৃঙ্খলে আবদ্ধরূপে রাজধানীতে প্রেরিত হইলে বঙ্গী শিখবীরগণ একে একে ঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। বাকসার উপর নিজহস্তে আপনার শিশুপুত্রকে বধ করিবার আদেশ দেওয়া হইল। বাকসা ধীর গভীরভাবে অবচলিত চিত্তে সেই আদেশ প্রতিপালন করিলেন এবং পরে অতি নৃশংসভাবে তাঁহার ইত্যাকার্য্য সংস্কারিত হইয়াছিল। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে নৈয়দ প্রাক্ষুগল করকুখশিরকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করেন। এই সময়ে নৈয়দ প্রতাদের ক্ষমতা অসাধারণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহার ফলস্বরূপ ইচ্ছা বাদশাহ করিতেম। এই ক্ষাবে এক বৎসরের মধ্যে তাহারা পর পর তিন জনকে হিন্দার সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বাদশাহদের মধ্যে মহম্মদ শাহ ১৭১৯—১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে

পারিত্যাহিলেন। মহম্মদ শাহ সৈয়দ হোসেন আলীখাঁকে
 হত্যা করিত্যাহিলেন এক সৈয়দ আবদুল্লাহকে বন্দী
 করিত্যাহিলেন। মহম্মদশাহের সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের
 ক্ষয় হয়। মহম্মদ শাহের মন্ত্রী ছিলেন আসফ জাহ।
 আসফ জাহ আওরঙ্গজেবের আমলেই একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী
 বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট এক
 নিজামউল মুলক এই দুইটা উপাধি ছিল। তিনি মন্ত্রী
 হইয়া রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধানের জন্য মনোযোগী হইলেন
 বটে, কিন্তু প্রতিপদে অন্যায়ভাবে বালাশাহের নিকট হইতে
 বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার তিনি মন্ত্রির পদ পরিত্যাগ করিয়া
 দাক্ষিণাত্যে গমন পূর্বক সেখানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব
 করিতে লাগিলেন—হারজোবাদের নিজাম রাজবংশ
 এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। নিজামের ন্যায় অযোধ্যার
 সুবাদার সাদ আলী খাঁ, বঙ্গালার সুবাদার আলিবর্দী খাঁ,
 জাঠগণ, আসপান জাতীয় রোহিলাগণ সকলেই স্বাধীনতা
 ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে চাক্ষুণিক জীবন
 অশান্তি ও গোলযোগের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যের সুজাট্, নাদির শাহ ভারতবর্ষ
 আক্রমণ করিলেন। কর্ণালের নিকট মুঘল সৈন্য তাহার
 নিকট পরাজিত হইল। আরবিশ হাজার মুঘল সৈন্যের

এই যুদ্ধে প্রাণনাশ হইয়াছিল। মহম্মদ শাহ নাদির শাহের শিবিরে বাইয়া সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার সহিত রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করেন। অকস্মাৎ নগর-মধ্যে নাদির শাহের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার দিল্লীর অধিবাসিগণ পারসিক সৈন্যাদিকে আক্রমণ করে। ইহাতে নাদিরশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া যে হত্যাকাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিলেন সেই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কথা মানুষ কোনদিন বিস্মৃত হইবে না। নাদির দিল্লীর রাজপথ নর-বস্ত্রশ্রোতে ভাসাইয়া এবং আটান্ন দিন পর্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া দিল্লীর সমুদায় ধনরত্ন, মণিমুক্তা লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি শাহজাহানের মস্তুর সিংহাসন খানাও পারস্য দেশে লইয়া গেলেন। নাদির শাহের এই আক্রমণে দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্য একরূপ লোপ পাইল। মুঘল সম্রাটেরা নামে মাত্র বাদশাহ রহিলেন। মারাঠারা এই সময়ে প্রবল শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল— তাহারা মুঘল সম্রাটের নিকট হইতে চৌখ পর্যন্ত আদায় করিয়া লইতেন।

নাদিরশাহের আক্রমণে মুঘল রাজ্য ধ্বংসপ্রায় হইয়া ছিল। ইহার পরে দিল্লীর বাহিরে দিল্লীর বাদশাহদের আর নেইরূপ ক্ষমতা ছিল না। মহম্মদশাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আব্দুল্লাহ শাহ বাদশাহ হইলেন। ইহার কিছু

পূর্বে আহমদশাহ শাহ দুরাণী ভারতবর্ষে আক্রমণ করেন। আহমদশাহ নাদির শাহের অধীনে আকস্মানিস্থানে শাসন কর্তা ছিলেন। নাদিরশাহের মৃত্যুর পরে তিনি স্বাধীন ও ক্ষমতামণ্ডলী হইয়া উঠেন। ১৭৫৬—১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আহমদশাহ দুরাণী ভারতবর্ষে আসিয়া দিল্লী লুণ্ঠন এবং মথুরায় সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে হত্যা করেন।

তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ

১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আহমদশাহ তাহার হস্তচ্যুত পঞ্জাব পুনরায় অধিকার করিলেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা তাহাদের অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য এক বিপুল সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন। মারাঠা কলের সেনাপতি হইলেন পেশোয়ার সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র বিশ্বাসরাও। বিশ্বাস রাও সাহসী ছিলেন, কিন্তু সেনাপতি হইবার যোগ্যতা তাহার ছিল না। মারাঠারা দিল্লী অধিকার করিয়া পাণিপথে আহমদ শাহ দুরাণীর সম্মুখীন হইলেন, উভয় পক্ষ শিবিরের চারিদিকে পরিখা কাটিয়া প্রস্তুত

হইতে লাগিলেন। অবশ্যকার শাসনকর্তা মুজাদ্দোলা আহমেদশাহর পক্ষাবলম্বন করিলেন। তীব্র যুদ্ধ হইল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী ভোরবেলা মারাঠার সমস্ত সৈন্য লইয়া আহমদ শাহ তুরানীকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধের পরিণাম অতি ভয়াবহ হইল। মারাঠাদের অতি নিদারুণ পরাজয় ঘটিল। তাহাদের উত্তর ভারত সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন চিরদিনের জন্য ভাঙিয়া গেল। এই যুদ্ধে মারাঠাপক্ষের প্রায় দুই লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছিল এবং সদাশিব রাও, বিশ্বাস রাও প্রভৃতি প্রধান সেনাপতিগণ সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। পাণিপথের এই যুদ্ধে হিন্দুজাতির পুনরুত্থানের আশা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল, আর মুঘল সাম্রাজ্য লোপ পাইল।

মুঘল রাজত্বকালে ভারতবর্ষের অবস্থা

বাবর যেদিন ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন সে দিন হইতে ইংরাজের প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত প্রায় আড়াই শত বৎসর কাল মুঘল সম্রাটেরা ভারতবর্ষের উপর আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। মুঘল সম্রাটদের রাজত্বকালে তাহাদের সংগ্রবে আসিয়া হিন্দুরা

আচার ব্যবহারে, পাশতক্ষেপে, তাঁহার প্রত্যেক বিষয়েই
বিজেতা মুসলমানদের আচার-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন,

সামাজিক

মিলন

মুসলমানেরাও সেইভাবে হিন্দু

প্রতিবেশীর আচার-ব্যবহার গ্রহণ

করিয়াছিলেন। এইরূপে দুই জাতিই

পরস্পরে ক্রমশঃ মিলনের পথে আসিয়াছিলেন।

মুঘল সম্রাট্ আকবরের উদার নীতি, শাসন প্রণালী
ও সহনশীলতা উভয় জাতির মিলনের পথ অনেকটা

সুগম করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু আওরংজীবের সঙ্কীর্ণতা,

ধর্ম্মভক্ততা, আকবরের তুলনায় দৃষ্টি ও পরিশ্রম ব্যর্থ

করিয়া দিয়াছিল। আওরংজীব হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে

যে দারুণ ঘৃণা ও বিবেচকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহারই

ফলে উভয় জাতির মিলনের আশা লোপ পাইয়াছিল।

মুঘলের বেশশাসনের

ব্যবস্থা

পাঠান বীর শেরশাহ ও মুঘল

সম্রাট্ আকবর দেশের শাসন

শৃঙ্খলার জন্য নানাক্রমে ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সুবাদদেশে একজন সুবাদারের

অধীনে থাকিত, তাঁহার অধীনে আবার অনেক

রাজ-কর্মচারী নিযুক্ত থাকিত। রাজ-কার্য্য নির্বাহ

করিতেন। ঐ সকল কর্মচারীর মধ্যে দেওয়ানই ছিলেন

প্রধান। দেওয়ান রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিতেন, আর সুবাদার কৌজদারী কিছর, মুন্সের ব্যবস্থা, সৈন্দের বা কর্মের তত্ত্বাবধান করিতেন। বাদশাহের অধীনতা মানিয়া নিয়মিতভাবে রাজস্ব দিয়া আসিলেও সুবাদার একরূপ স্বাধীন ভাবেই সুবা শাসন করিতেন। বাদশাহ কোনরূপ বাধা দিতেন না। সুবাদারের পদও বংশাধিকৃতিক ভাবে চলিত।

হিন্দু ও মুসলমান রাজপুরুষ—মুঘল রাজত্ব-কালে কি দেওয়ানি, কি কৌজদারী প্রত্যেক বিভাগেই হিন্দুরা রাজকার্যে নিযুক্ত হইতেন। হিন্দুদের শাসন-নৈপুণ্য মুঘল সম্রাটেরা বিশেষ ভাবে মানিতেন। আকবর, টোডরমল্ল, মানসিংহ প্রভৃতি হিন্দু সুবাদার, সেনানায়ক ও রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত করিয়া রাজ্যের বিশেষ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হিন্দু বিদ্বানী আওরংজীবও হিন্দু সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মুঘল সম্রাটেরা দরিদ্র ও অলমর্থ ব্যক্তির সাহায্যের জন্য ভূমি দান করিতেন। যোগ্য রাজ-কর্মচারী এবং বেনীর ভাগ তাঁহাদের সেনাপতিরা জায়গীর লাভ করিতেন। জায়গীরের মালিকদের বংশধরেরা পরবাস্তু সে সময় জায়গীরের মালিক হইত, ইহার কালে সরকারের খাস জমি হ্রাস পাইতেছিল

দেখিতে পাইয়া আকবর এই ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিয়া

জায়গীর ও জমিদার প্রকল্প কর্মচারীভবন কেন্দ্রের ব্যবস্থা

করিয়া দেন। কিন্তু পুরে অনেক মুসল

সম্রাট এই নিয়ম তুলিয়া দিয়া পুনরায় জায়গীরের ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন। এই জায়গীরদারদের দ্বারা ভূমির উপস্থ

ভোগী আর এক শ্রেণীর লোক জমিদার বলিয়া কথিত

হইতেন। ইহাদের বৎসর বৎসর রাজসরকারে রাজস্ব

জমা দিতে হইত। জমিদারেরা বাদশাহের দরবারে কেবল

মাত্র রাজস্ব দিয়া মুক্ত থাকিতেন এবং পূর্ব স্বাধীনতা

ভোগ করিতেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা রাখিবার জন্য মামলা

মোকদ্দমার বিচার করিতেন এবং সময় সময় নিজেরা

যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন।

মুসলমান আমলের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক

—মুসলমানদের কাছে ভারতবাসী ইতিহাসের অন্য খণী।

হিন্দুরা কোনদিন ইতিহাস লিখিতেন না, কিন্তু মুসলমানেরা

এই অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাহারা অনেক ইতিহাস

লিখিয়া গিয়াছেন, কয়েকখানা ইতিহাস মুঘল বাদশাহেরাও

লিখিয়াছিলেন। কাকি, আবুলক্বল, কাকি বা
এক তাঁহারের পূর্ববর্তী মীনহাজ্জুদ্দিন, মিরাজ, জিয়া
উদ্দিন হারুনি প্রভৃতি প্রধান ঐতিহাসিকগণের নাম চির-
স্মরণীয় হইয়া আছে। আবুল ক্বল্লের আইন-ই-আকবরী,
এবং আকবর-নামা এ দুইখানি গ্রন্থে আকবরের সময়ের
ইতিহাস বিস্তার ভাবে লিখিত আছে। কাকি খাঁ
আওরংজীবের আমলের লোক। আওরংজীব ইতিহাস
লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া কাকি খাঁ বা গুলু
লেখক এই নামে ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত
নাম মুহম্মদ হাশিম। সত্ৰাট্, বাকর ও জাহাঙ্গীর আপনাদের
জীবন চরিত লিখিয়া গিয়াছেন। আর একজন বিখ্যাত
মুসলমান ঐতিহাসিকের নাম গোলাম হোসেন খাঁ; ইনি
মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সময় হইতে ইংরাজ জাতির অভ্যুদয়
কাল পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাসের
নাম মুতাক্বরীণ।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্ম্মের বিশেষ
আন্দোলন হয়। হিন্দু-ধর্ম্মের
ভারতবর্ষের সাহিত্য সেই আন্দোলনে দেশী ভাষার
উন্নতি হইয়াছিল। মুঘল আমলেও এই প্রভাব বিস্তারিত
হইয়া মুঘল শাসনকালেই কবিতার পণ্ডিতের রামায়ণ

মুসলমানের চণ্ডী, কালীরাগের মত মন্দির, কামরোয়া
 দেবের শ্যামা বিঘড় মন্দির, ভারতের সাতের মন্দির
 এবং বহু বৈকুণ্ঠ কবির পলাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল।
 এই সময়ে তুকারামের রচনা মহারাষ্ট্রের ভাষাকে গৌর-
 বাহিত করিয়াছিল। আকবরের রাজত্বকালে হিন্দু কবি
 ভুলসীদাস তাঁহার রামায়ণ রচনা করেন।

মুসলমানেরা এদেশে আসার ফলে ভারতবর্ষের বিবিধ
 হাপতা-শিল্প, চিত্র-শিল্প ও ললিতকলা বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া-
 ছিল। যুবলেরা স্থপতি-বিদ্যায়
 সজীত ইত্যাদি বিশেষ দক্ষ ছিলেন।*

শাহদের নির্মিত দুর্গ, প্রাসাদ, জোয়ার, সমাধি প্রভৃতি
 আজিও পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া
 আছে। আগ্রার লোহিত প্রস্তর নির্মিত দুর্গ, সেকেন্দ্রার
 মনোহর উদ্যান-মধ্যস্থিত আকবরের সমাধি, ফতেপুর
 সিক্রীর মিনার ও বিভিন্ন মহাল, ইতিমধ্যে উদ্দোলার
 সমাধিমন্দির, শাহজাহানের নির্মিত অতুলনীয় মন্দির
 পাথরের তাজমহল, দুর্গ, মতিমসজিদ ও শত শত সমাধি
 হস্তা এখনও মুঘল স্থপতিদের অসাধারণ শিল্পকৌশল
 প্রকাশ করিতেছে। মুঘলদের সময়ে ভারতবর্ষে সজীত
 বিদ্যাও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তানসেনের স্থায়

সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি, আকবরের দরবারের অলঙ্কাররূপ ছিলেন। মুঘল চিত্রাঙ্কন-নীতি একটি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল।

ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ প্রভৃতি জাতি মুঘলদের শাসনকালে ভারতবর্ষের ব্যবসায় বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিয়া বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন এবং অনেক স্থলে আকস্মিকরূপে জম্মা দুর্গও নির্মাণ করিয়াছিলেন। মুঘল রাজত্বের শেষ অবস্থায় স্থানীয় রাজ-কর্মচারীদের অর্থ-লোভের দরুণ সে সময় লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না, এই জন্য সেই সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই।

মুঘল রাজত্বকালে কয়েকজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে আসেন। ইকিন্স ও বিদেশী ভ্রমণকারীদের স্যার টমাস রোর বিষয় পূর্বেই বিবরণ বলিয়াছি। ইকিন্স জাহাঙ্গীরের অতি প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তিনি এবং রো মুঘল দরবারের এবং বাহাদুর জাহাঙ্গীরের চরিত্রের এক অতি সুন্দর বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। শাহজাহানের রাজত্বের শেষ অবস্থায়

যখন সিংহাসন হইয়া তাঁহার পুত্রদের মধ্যে ভরানক গোলাবোগ ও অশাস্তি চলিতেছিল, সেই সময়ে—
 করাসীদেশীয় পর্যটক বর্ণিয়ার এদেশে আসেন। বর্ণিয়ার
 এদেশের ব্যবসায়-বারিজ্য, ধন সম্পদ এবং মুঘল দরবারের
 ঐশ্বর্য ও জাঁক জমকের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া
 গিয়াছেন। রাজকর্মচারীরা সাধারণের উপর বড়
 অত্যাচার করিত। আশুরঞ্জীবের রাজত্ব কালে মেমুমী
 নামক ইটালী দেশের একজন ভ্রমণ কারী ভারতবর্ষে
 আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের সম্বন্ধে একখানা
 খুব বড় বই লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা পড়িয়া ভারতবর্ষের
 সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। সে সময়ে
 দরবারে পারস্য ভাষার ব্যবহার ছিল, তবে সাধারণে উর্দু
 ভাষায় কথোপকথন করিত।

মুঘল রাজত্বে বাঙ্গলাদেশ একরূপ স্বাধীন ছিল।
 মুঘলদের রাজত্বকালে যে সকল শাসনকর্তা বাঙ্গলাদেশ
 শাসন করিতেন তাঁহাদের মধ্যে দাউদখাঁ মুঘলদের অধীনতা
 পছন্দ করেন নাই। তিনি স্বাধীন ইচ্ছার চেষ্টা করিতে
 বাইয়া অবশেষে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সেকালে দিল্লী
 হইতে বাঙ্গলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া আসিতেন।
 এই সকল শাসনকর্তাদের মধ্যে শাহজাহানের দ্বিতীয়

পুত্র, শাশুবা, শাশুজ্ঞা, বা, মাকসুদা, ইত্যাদি প্রধান ছিলেন। কি পাঠানদের সময় কি মুঘলদের সময় বাঙ্গলাদেশের অধিদারেরা স্বাধীন রাজাদের মত থাকিতেন। সেকালে তাঁহাদের প্রধান বারো জনকে বারো ভূঁইয়া বলিত। ঈশাখাঁ, বিক্রমপুরের কেলার রায়, ঘশোহরের প্রতাপাদিত্য মুঘলদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পূর্ণ স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মুঘলদের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। মোটের উপর সমগ্র বাঙ্গলাদেশই মুঘলদের অধীন হইয়াছিল।

বাঙ্গলাদেশের সুবাদারগণের মধ্যে মুর্শিদকুলিখাঁ ও আলিবর্দীখাঁ প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুর্শিদকুলিখাঁ ঢাকা হইতে রাজধানী মুকসুদাবাদে লইয়া আসেন এবং নিজের নামানুসারে উহার নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ।

মুঘল রাজত্ব সময়ে আলিবর্দীখাঁ যখন বাঙ্গালার শাসন কর্তা তখন মারহাটা বর্গীদস্যুরা বাঙ্গলাদেশে নানারূপ অত্যাচার ও নিৰ্য্যাতন করিয়াছিল। আলিবর্দীখাঁ কোনরূপেই তাহাদিগকে দমন করিতে না পারিয়া অবশেষে সন্ধি করিবার হলে ভাস্কর পণ্ডিতকে নিজ শিবিরে আনয়ন করিয়া হত্যা করেন। ভাস্কর পণ্ডিতের এই খোচনীয় হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য পরবৎসর বর্গীরা বহু

লোকজন লইয়া বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিল। আফগান
নিকরসায় হইয়া তাহাদিগকে বার্ষিক কয় লক্ষ টাকা ও
উড়িয়া প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিলেন। বাঙ্গালাদেশে
বর্গীর অত্যাচারের দ্বারা অত্যাচার কোন দিনই হয় নাই।
এখনও ছরস্ত শিশুদিগকে ঘুম পাড়াইবার সময় জননী
গদহিয়া থাকেন,—

“ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে।

বুলবুলিতে ধান ঝেড়েছে খাজনা দিব কিসে।”

এই সময়ে ইউরোপের নানাজাতি বাঙ্গালাদেশের
নানা স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। পর্তুগীজেরা
মেঘনার মোহনায় এক দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল। তাহারা
এবং আরাকানের মগেরা পূর্ব বাঙ্গালায় অনেক অত্যাচার
করিত। এই মগেদের ও ফিরিঙ্গিদের দমন করিবার জন্য
মুঘল শাসনকর্তারাও ইদ্রাকপুর সোনাকান্দা প্রভৃতি
পূর্ববঙ্গের নদীর তীরবর্তী স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন।
তাহাদের দমন করিবার জন্য ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত
হইয়াছিল।

মুঘল রাজত্বকালে ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা
বিশেষ ভাল ছিল এবং তাহারা অতি অল্পব্যয়ে বৃহৎ পরিবার
প্রতিপালন করিত। আকবরের রাজত্ব কালে খানসামগ্রীর

মুদ্রণ ভারত

১৪৬

মণ্ডরা কিরূপ দর ছিল, তাহার উল্লেখ করিয়াই আশাদের
এই শেষ করিলাম।

		গমের ময়দা (নিষ্কৃত)		১০/০
গম	১/৫	মুগার দাইল		১০/৫
ধব	১/৫	দুগ		২১০/০
ভূট্টা	১১/১০	তৈল		২২
সুবি চাউল	১০	গুড়		১১০/৫
জিরা (সরু)				
চাউল	১	হরিজা		১০
হুদ	১০/৫	কাণড়		
		প্রতি গজ		১০
পেঁয়াজ	১১/০	কম্বল (নিষ্কৃত)		১০
মটরের দাল	১/০			

সে যুগে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি মাসিক ১০/০ আনা
ব্যয়ে বিনাক্রম্বে জীবিকা-নির্বাহ করিতে পারিত।
মাসিক ১৫০/০ ব্যয়ে পাঁচ-ছয় জন লোক লইয়া, অনায়াসে
একটি পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যয়-নির্বাহ হইত।

এই সব নানা কারণে মুঘল ভারতে জনসাধারণ সুখ
এবং স্বাস্থ্যের ভিত্তি দিয়াই জীবন অতিবাহিত করিত।

সম্পূর্ণ